Registration No.: SO197407 of 2012-2013

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

পঞ্চদশ বর্ষ❖সংখ্যা - ৩❖সেপ্টেম্বর ২০২৫

পূর্ণ চন্দ্র গ্রহণ ও ব্লাড মুন

৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫
পূর্ণ গ্রহণ পর্যায়কাল রাত ১১টা থেকে ১২টা ২২ মিনিট

চিত্র গ্রহণ ঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জী

সম্পাদকীয় ঃ হনুমানজির মহাকাশ অভিযান
গল্পের ছলে বিজ্ঞান ঃ ডারউইনের আলোয়
বিশেষ রচনা ঃ হিমালয় পবর্তমালা আসন্ন ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি

ঃ সূচিপত্র ঃ

◈ সম্পাদকীয় ঃ ২

◈ বিজ্ঞান ও কুসংস্কার ঃ ৪
◆পূর্ণ চন্দ্র গ্রহণ ও ব্লাড মুন – কুসংস্কার বনাম বিজ্ঞান

◈ পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ ৬
◆পুনর্ব্যবহার প্রযুক্তি কি প্লাস্টিক দূষণের অবসান ঘটাবে?

◈ গল্পের ছলে বিজ্ঞান ঃ ১০
◆ডারউইনের আলোয়

◈ বিশেষ রচনা ঃ ১৩
◆হিমালয় পবর্তমালা আসন্ন ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি

◈ সমাজ দর্পণ ঃ ১৬
◆পূজা কমিটিগুলোকে সরকারি অনুদানের রাজনীতি ...
◆ভোটার তালিকা ... পঞ্জিকরণ যুক্তি ও মানবতা বিরোধী

◈ প্রশ্ন ও উত্তর ঃ ১৯
◆ভয় পেলে আমাদের লোম খাড়া হয়ে যায় কেন?
◆শিলাবৃষ্টি কেন হয়?
◆মাউন্ট এভারেস্ট কি চিরকাল ... সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হয়ে থাকবে?

◈ বিজ্ঞানের খবর ২২

◈ বিজ্ঞানের বিশেষ খরব ঃ ২৫
◆...হিমালয় সৃষ্টির আধুনিক বৈজ্ঞানিক মডেল জন্ম নিল

◈ শব্দের খেলা ২৭

◈ সমীক্ষা ঃ ২৮
◆অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে ... জনমত সংগ্রহ

◈ সংগঠন সংবাদ ৩৩

◈ ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ ৩৫
◆মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

◈ ছড়া ঃ ৩৯
◆সবুজ ফুসফুস

সম্পাদকীয় ঃ

হনুমানজির মহাকাশ অভিযান

‘ইউরি গ্যাগরিন নয়, রামায়ণ মহাকাব্যের অন্যতম চরিত্র হনুমানই প্রথম মহাকাশ যাত্রা করেন’। গত ২৩শে আগস্ট জাতীয় মহাকাশ দিবস পালন করতে গিয়ে বর্তমান সাংসদ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর, হিমাচল প্রদেশের উনা জেলাস্থিত একটি পিএম শ্রী বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এই বক্তব্য রাখেন। পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রশ্ন ছিল কে প্রথম মহাকাশ যাত্রা করেন? জবাবে পড়ুয়াদের কেউ বলে নীল আর্মস্ট্রং, কেউ বলে ইউরি গাগারিন ইত্যাদি। এরপর মন্ত্রী মশাই বলেন, “আমি মনে করি হনুমানজিই সর্বপ্রথম মহাকাশ যাত্রা করে।” ঐ অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক মশাইরা। এ কথায় ক্ষান্ত না হয়ে মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন “আমরা এখনকার হিসেবে নিজেদের দেখছি। হাজার হাজার বছর আগের ঐতিহ্য না জানলে জ্ঞান সংস্কৃতিকে আমরা একই জায়গাতেই থাকব, ইংরেজরা যা বুঝিয়েছে তা-ই বুঝব আমরা। তাই প্রধান শিক্ষক এবং আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব, পাঠ্য বইয়ের বাইরে বেরোন, আমাদের দেশের দিকে, ঐতিহ্য, জ্ঞানের দিকে তাকান। ঐ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে আরও অনেক কিছু জানতে পারবেন”। শুধু ঐ বিদ্যালয়ে নয়, সমাজ মাধ্যমেও ‘পবনপুত্র হনুমানজী ... প্রথম মহাকাশচারী’ এই শিরোনামে বিশ্বজগতের কাছে তাঁর এই বার্তা পৌঁছে দেন। এই ঘটনার ঠিক পরেরদিনই বর্তমান আর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ভূপালের এক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে বলেন, রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের বিমান আবিষ্কারের হাজার হাজার বছর পূর্বেই ভারতে পুষ্পক বিমানের অস্তিত্ব ছিল।

স্মরণ করা যেতে পারে, গত এক দশকের বেশি সময় ধরে ছোট-বড়-সুখ্যাত-অখ্যাত-নেতা-মন্ত্রী-ধর্মবাদী সহ হরেক ধর্মের কারবারিরা বিভিন্ন বক্তৃতায় পুরাণ-মহাকাব্যে বর্ণিত কাহিনীতে উল্লিখিত বিভিন্ন ঘটনা, চরিত্রকে ইতিহাস তথা বিজ্ঞানের মোড়কে মানুষের সামনে হাজির করার সচেতন প্রয়াস রেখে চলেছেন। ২০১৪ সালে প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং মহারাষ্ট্রে ডাক্তারদের এক সভায় বলেন, মহাভারতের অন্যতম চরিত্র কর্ণ মাতৃ গর্ভের বাইরে জন্মগ্রহণ করেন তার উল্লেখ আছে। যা প্রমাণ করে মহাভারত রচনার সময়কালে ভারতে প্রজনন

জেনেটিক্স-এর প্রচলন ছিল। পুরাণে উল্লিখিত গজানন দেবতা গণেশ-এর জন্মবৃত্তান্ত প্রমাণ করে মানুষের শরীরে কসমেটিক সার্জারি (নান্দনিক শল্যবিদ্যা) রপ্ত করেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি স্কুলের পাঠ্য-পুস্তকের মুখবন্ধে লেখেন হিন্দু দেবতা রামই প্রথম বিমান চালনা করেন ও অতীত ভারতে স্টেম সেল প্রযুক্তির প্রচলন ছিল ইত্যাদি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় অতীতের ভারত কতটা এগিয়ে ছিল তা বোঝানোর জন্য বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন সময়ে কখনও মহাকাশ বিজ্ঞান, কখনও পরমাণু বিজ্ঞান, কখনও উপগ্রহ ও ইন্টারনেটের অস্তিত্বের দাবি করেছেন। উক্ত সকল ক্ষেত্রেই স্কুল-কলেজ ও উচ্চশিক্ষায় পাঠরত পড়ুয়াদের শ্রোতা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সাধারণ মানুষদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়া বেশ কিছু কাল্পনিক মন্তব্য বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যেমন, গরুর মল-মূত্র ক্যান্সারসহ সমস্ত রোগ হরণকারী, গরুই একমাত্র প্রাণী যে অক্সিজেন উৎপাদন করে, গরুর দুধে সোনা আছে, ময়ূরের অশ্রু পান করে ময়ূরী গর্ভধারণ করে ইত্যাদি। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কি কাকতালীয়?

বিজ্ঞানের জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মঞ্চকেও অবিজ্ঞান তথা ছদ্মবিজ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করার উদাহরণও রয়েছে। ২০১৫ সালে ১০২তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ সিম্পোজিয়ামে 'সংস্কৃত ভাষায় পৌরাণিক বিজ্ঞান' বিষয়ক একটি পেপারকে জায়গা করে দেওয়া হয় যেখানে মূলতঃ দাবি করা হয় যে বৈদিক যুগে বিমান প্রযুক্তি ছিল আজকের তুলনায় অনেক উন্নত। ঐ সম্মেলনে 'পৌরাণিক ভারতে উদ্ভিদ বিদ্যায় প্রকৌশলের প্রয়োগ', 'যোগ ব্যায়ামের স্নায়ু বিজ্ঞান', 'পৌরাণিক ভারতে শল্য চিকিৎসার প্রসার', 'পৌরাণিক ভারতের স্থাপত্য ও পূর্ত প্রকৌশলে বৈজ্ঞানিক নীতি' সংক্রান্ত পেপারগুলি কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছাড়াই কীভাবে উপস্থাপিত হল, এ নিয়ে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্য থেকে তুমুল সমালোচনা উঠে আসে। ঐ সমস্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী রামকৃষ্ণণ ভেঙ্কটরমন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসকে 'সার্কাস' বলে অভিহিত করেন। বর্তমানে বিজ্ঞান কংগ্রেস এ্যাসোসিয়েশন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে সামনে রেখে ও বিজ্ঞান কংগ্রেসকে 'অলাভজনক' আখ্যা দিয়ে ১০৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যে সমাজ পরিচালকেরা দেশের বিজ্ঞানের সাফল্যে জয়োল্লাস প্রদর্শন করেন, বিশ্ববাসীর কাছে বিজ্ঞানীদের সাফল্য সগৌরবে জানান দেন, দেশের মানুষকে গর্ব অনুভব করতে শেখান তারাই আবার বিজ্ঞানের নামে অবিজ্ঞান বা ছদ্মবিজ্ঞানের পক্ষে দাঁড়ান, সমাজে কুসংস্কার টিকিয়ে রাখার সপক্ষে দাঁড়ান? এই মরীয়া প্রচেষ্টার পিছনে যে কারণ কাজ করছে তা কি কেবলই প্রচারকদের অজ্ঞানতা নাকি তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস? আসলে, এর শিকড় প্রোথিত রয়েছে সমাজ ব্যবস্থার গভীরে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিজ্ঞানমনস্কতার অগ্রগতি সমার্থক নয়। এই দুই অগ্রগতি একসাথে ঘটুক তা শাসকের কাম্য নাও হতে পারে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া যা মানুষের কৌতূহল নিরসনের সহজাত প্রবণতা দ্বারা পরিচালিত হয়। বিজ্ঞানের প্রতিটি বিকাশ নতুন ধারণার জন্ম দেয় যা পুরান ধারণার সাথে প্রাথমিকভাবে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করলেও ধীরে ধীরে পুরান ধারণা নতুন ধারণা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এর ফলে সামাজিকভাবে সাধারণ মানুষের চেতনার বিকাশ হয়, বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার ঘটে, মানুষ তার উপর ঘটে চলা অন্যায়, অবিচারের কারণ বুঝতে শেখে ও তার প্রতিবাদ করতে শেখে। পুরান ধারণাকে জোর করে টিকিয়ে রাখা হলে মানব মনে বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষের প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। সমাজে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার যদি শাসকেরই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তবে শাসক নিজেই পুরান ধারণা ও মতবাদ টিকিয়ে রাখার সংঘটিত ও সুপরিকল্পিত প্রয়াস জারি রাখে। তারই পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল কলেজের পাঠ্যক্রমে ধর্মবাদ, ঈশ্বরবাদ, অবিজ্ঞান, ছদ্মবিজ্ঞান ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সমাজে বিজ্ঞানচেতনা প্রসারের বাধা হিসাবে অবস্থান করে। ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ যেমন রয়েছে, আবার এই বাধাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে তা অতিক্রম করার উদাহরণও রয়েছে অনেক। ■

"বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধকার ক্রমশ দূর হইতেছে। কিন্তু যাহা যাইতেছে তাহার স্থানে নতুন জঞ্জাল কিছু জমিতেছে ... সকল দেশেই বিজ্ঞানের নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যেসব ভ্রান্ত ধারণা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে। ... কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক নামের মোহিনী শক্তি আছে, লোকে সেই নাম শিখিলে স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করেন।"

– অপবিজ্ঞান, রাজশেখর বসু

বিজ্ঞান ও কুসংস্কার ঃ

পূর্ণ চন্দ্র গ্রহণ ও ব্লাড মুন
কুসংস্কার বনাম বিজ্ঞান

৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫। ভারতীয় সময় রাত ৮.৫৮ মিনিট। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে আট থেকে আশি বিস্ময়বিহ্বল চোখে তাকিয়ে ছিল আকাশের পানে। এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন শহর সহ ভারতের অধিকাংশ জায়গা থেকেই দেখা গেল এক বিরল মহাজাগতিক দৃশ্য। পূর্ণ চন্দ্র গ্রহণ এবং পূর্ণ গ্রহণ পর্যায়কালে রাত ১১টা থেকে ১২টা ২২ মিনিট পর্যন্ত দীর্ঘ ৮২ মিনিট ধরে লাল চাঁদ অর্থাৎ ব্লাড মুন এর অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেছে। গ্রহণ শেষ হয় ভারতীয় সময় ৮ই সেপ্টেম্বর রাত ২.২৫ মিনিটে। কিন্তু এই মনোমুগ্ধকর ঘটনার রেশ থেকে যাবে সারা জীবন ধরে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু বছর ধরে চন্দ্র গ্রহণ নিয়ে অনেক মিথ বা কল্পকাহিনী প্রচলিত রয়েছে। চীন দেশের মানুষেরা মনে করতো একটি ক্ষুধার্ত ড্রাগন বা স্বর্গের কুকুর চাঁদকে গিলে ফেলেছে। ড্রাগন চাঁদকে গিলে ফেললে মহাবিশ্বে প্রচন্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। তাই চন্দ্র গ্রহণ শুরু হলে তারা ড্রাগনকে ভয় দেখাতে জোরে জোরে শব্দ করতো। ঢোল পেটাতো, বাজি ফাটিয়ে চিৎকার করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল এতে ড্রাগন ভয় পেয়ে চাঁদকে ছেড়ে দেবে। নরওয়ের প্রাচীন উপকথায় সূর্য ও চাঁদকে দুটি নেকড়ের তাড়া করা এবং একটি নেকড়ে যখন চাঁদকে ধরে ফেলে তখন চন্দ্র গ্রহণ হয় বলে কথিত আছে। মেসোপটেমিয়ার মানুষেরা চন্দ্র গ্রহণ হলে কোনও রাজার বিপদ ঘটতে পারে সেই আশঙ্কায় সাধারণ মানুষকে রাজার পোশাক পরিয়ে দিত। তারা ভাবতো সাধারণ মানুষের ওপর দিয়ে বিপদ চলে গেলে রাজা রক্ষা পাবে। দক্ষিণ আমেরিকার কিছু আদিবাসী চাঁদের অসুস্থতাকে চন্দ্র গ্রহণের কারণ মনে করতো। অসুস্থতা বা দুর্বলতার কারণে চাঁদ ধীরে ধীরে ম্লান হতে থাকে। তাই তারা চাঁদকে সুস্থ ও সবল করতে বিভিন্ন ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতো। মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতার অধিবাসীরা চাঁদ এবং সূর্য পরস্পরের মহাজাগতিক সংগ্রামে সংযুক্ত হিসেবে মনে করতো। চন্দ্র গ্রহণকে বিপদ বা পরিবর্তনের সময় বলে মনে করতো। তারা ভাবতো দেবতারা রাজাদের এবং সমাজের ভাগ্যকে প্রভাবিত করার জন্য গ্রহণ ঘটাতো। প্রাচীন গ্রিসে চন্দ্র গ্রহণকে রাজনৈতিক ঘটনার ক্ষেত্রে দেবতাদের ক্রোধের ফল হিসাবে দেখতো। জাপানের কাহিনীও বেশ মজাদার। তারা মনে করতো, স্বর্গীয় আত্মা বা দেবতারা সাময়িকভাবে চাঁদকে ঢেকে রাখায় চন্দ্র গ্রহণ হয়। জাপানি আরেকটি মতে, চাঁদ কোনও ক্রুদ্ধ দেবতা বা স্বর্গীয় ব্যক্তিত্বের কারণে লুকিয়ে থাকে। সেই সময়টাই হল চন্দ্র গ্রহণের সময়। আফ্রিকান জুলুদের গল্পে, চন্দ্র গ্রহণকে শক্তিশালী আধ্যাত্মিক ঘটনার ফল হিসেবে মনে করা হতো। তাঁরা

মনে করতো যে চাঁদকে একটি বিশাল কুমির বা সাপ খেয়ে ফেললে গ্রহণ হয়, কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে রাখতে না পারায় শীঘ্রই চাঁদ মুক্ত হয়ে স্বমহিমায় ফিরে আসে। ভারতে চন্দ্র গ্রহণ আর রাহু ও কেতুর গল্প কে না জানে? বিষ্ণু পুরাণের একটি বিখ্যাত কাহিনী অনুযায়ী সমুদ্র মন্থনের সময় রাহু অমৃত চুরি করেছিল। রাহু তা গিলে ফেলার সময় দেবতাদের হাতে ধরা পড়ে। প্রতিশোধ হিসেবে বিষ্ণু তার শিরচ্ছেদ করে। তবুও তার মাথা আর দেহ সূর্য আর চাঁদকে তাড়া করতে থাকে। রাহু যখন চাঁদকে ধরে ফেলে তখন চন্দ্র গ্রহণ হয় অর্থাৎ রাহু'র গ্রাসে চাঁদ চলে যায়।

কল্পকাহিনী তো অনেক হল, কিন্তু এবার চন্দ্র গ্রহণের বৈজ্ঞানিক কারণ জেনে নেওয়া যাক। চন্দ্র গ্রহণ সম্পূর্ণ একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। আমরা জানি, চাঁদের নিজস্ব কোনও আলো নেই। সূর্যের আলোয় আলোকিত। তাই যখন সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে পৃথিবী চলে আসে এবং সূর্যের আলোকে চাঁদে পৌঁছাতে বাধা দেয় তখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপর পড়ে তাই চাঁদ কিছু সময়ের জন্য অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। এটাই চন্দ্র গ্রহণের বিজ্ঞানসম্মত কারণ।

চন্দ্র গ্রহণের কার্যকারণ সম্পর্কে যেমন অনেক মিথ রয়েছে, ঠিক তেমনই গ্রহণের সময় কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয় সে সম্পর্কেও নানান কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত আছে। কুসংস্কারের কয়েকটি উদাহরণে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। *চাঁদ থেকে নির্গত ক্ষতিকর রশ্মি খাবারের পুষ্টিগুণ নষ্ট করে দেওয়ার আশঙ্কায় গ্রহণ চলাকালীন কাঁচা খাবার, ফল ও শাকসবজি না খাওয়ার পরামর্শ। *খাবার হজম করতে বেশি সময় লাগে তাই মাংসজাতীয় খাবার খাওয়া বারণ। *চাঁদ থেকে নির্গত শক্তিশালী রশ্মি খাদ্য দূষিত বা ক্ষয় করতে পারে তাই চন্দ্র গ্রহণের আগে খাবার রান্না করা উচিত

নয়। *চন্দ্র গ্রহণ শেষ হওয়ার পর স্নান করে নেওয়া উচিত। *গর্ভবতী মহিলাদের এই সময় বাইরে যেতে বারণ করা হয়। এমনকি অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়। *অনেকেই চন্দ্র গ্রহণের সময় খাবারে হলুদের ব্যবহার বাধ্যতামূলক মনে করেন। *খালি চোখে চন্দ্র গ্রহণ দেখলে ক্ষতি হয় ইত্যাদি।

এইসকল অন্ধবিশ্বাসের কোনও বিজ্ঞানসম্মত কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। পুরোটাই মানুষের কল্পনা থেকে উদ্ভূত ভ্রান্ত চিন্তাধারা। হলুদে বিভিন্ন পুষ্টিগুণ আছে এবং শরীরের জন্য অবশ্যই উপকারী। কিন্তু চন্দ্র গ্রহণের সময়ের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। খালি চোখে চন্দ্র গ্রহণ দেখলে কোনও ক্ষতি হয় না। তবে অনেক সময় উড়ন্ত কোনও পোকা চোখে এসে পড়তে পাড়ে। গর্ভবতী নারীরা চন্দ্রগ্রহণের সৌন্দর্য উপভোগ করলে গর্ভের শিশুর ক্ষতি হতে পারে, এই ধারণারও কোনও সত্যতা নেই। গ্রহণের সময় জীবাণু বৃদ্ধি পায় না। এমনকি মহাকাশ থেকে কোনও ক্ষতিকর রশ্মি আসে না।

চন্দ্র গ্রহণের সঙ্গে টকটকে লাল চাঁদ। এ যেন একটার সঙ্গে আরেকটা ফ্রি। সাম্প্রতিক কালে এত দীর্ঘ সময় ধরে পূর্ণ চন্দ্র গ্রহণ বিরল। এবারের পূর্ণগ্রাস চন্দ্র গ্রহণকে 'সুপার ব্লাড মুন' নাম দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই সুপার ব্লাড মুন সাধারণ সময়ের চাঁদের থেকে আকারে প্রায় সাত শতাংশ বড় এবং উজ্জ্বলতায় প্রায় পনেরো শতাংশ বেশি।

চন্দ্র গ্রহণের পাশাপাশি রক্তিম চন্দ্রিমা অর্থাৎ ব্লাড মুন নিয়েও গল্পকথা ও কুসংস্কার কম নেই। প্রাচীন অনেক সংস্কৃতিতে ব্লাড মুনকে অমঙ্গলজনক বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন ইনকা সভ্যতায় মানুষেরা বিশ্বাস করতো জাগুয়ারের আক্রমণের ফলে চাঁদের বুক থেকে রক্ত ঝরছে। তাদের আরও বিশ্বাস জাগুয়ার পৃথিবীতে নেমে এসে মানুষের ওপর আক্রমণ করতে পারে। তাই তারা কুকুর পিটিয়ে হিংস্র প্রাণীদের ভয় দেখাতো। চন্দ্র গ্রহণ ও লাল চাঁদের সময় গর্ভবতী নারীরা কোনও ধারালো বস্তু ধরলে ঠোঁট কাটা সন্তানের জন্ম দিতে পারেন বলে মেক্সিকো ও লাতিন আমেরিকার অনেকে মনে করতো।

কোনও কুসংস্কার নয়, ব্লাড মুন হওয়ার কারণ হল রেলেই বিক্ষেপণ (Rayleigh Scattering) নামক একটি প্রক্রিয়া, যা পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে হয়ে থাকে। লাল চাঁদের বিজ্ঞানসম্মত কারণগুলো পরপর ব্যাখ্যা করলে যা পাই তা হল – *সূর্য থেকে আসা আলো বিভিন্ন রঙের আলোর মিশ্রণ, অর্থাৎ তাতে রয়েছে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো। যাকে আমাদের দৃশ্যমান আলো হিসেবে চিনি। *যখন পূর্ণ চন্দ্র গ্রহণের সময় সূর্য, পৃথিবীর এবং চাঁদ একই সরল রেখায় আসে তখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে। কিন্তু সূর্যের কিছু আলো পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের মধ্য দিয়ে বেঁকে (প্রতিসরণ) চাঁদের ওপর গিয়ে পড়ে। *পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে থাকা ধুলিকণা, গ্যাস (যেমন নাইট্রজেন, অক্সিজেন) এবং অন্য কণাগুলো সূর্যের আলোকে বিক্ষিপ্ত করে। এই বিক্ষেপণ সব রঙের জন্য সমান হয় না। নীল এবং বেগুনি রঙের আলো ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কারণে বায়ুমন্ডলের কণা দ্বারা সবচেয়ে বেশি বিক্ষিপ্ত হয়। এ কারণেই সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময়কাল ছাড়া অন্য সময় আমরা আকাশকে নীল দেখি। *অন্যদিকে কমলা ও লাল রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য তুলনামূলকভাবে বড়। ফলে এই আলো বায়ুমন্ডল দ্বারা কম বিক্ষিপ্ত হয় এবং এটি পৃথিবীর বায়ুমন্ডল ভেদ করে চাঁদের দিকে যেতে পারে। যখন এই লালচে আলো চাঁদের পৃষ্ঠে পৌঁছয় তখন তা প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এর ফলস্বরূপ আমরা পৃথিবী থেকে চাঁদকে লাল বা কমলা রঙের দেখতে পাই। যা আমরা ব্লাড মুন হিসেবে চিনি। ব্লাড মুন কোনও অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা নয়, বরং এটি আলোর প্রতিসরণ ও বিক্ষেপণের একটি প্রাকৃতিক উদাহরণ। যা পূর্ণ চন্দ্র গ্রহণের সময় ঘটে।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বহু বছর আগে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, **"আমি ক্লাসে এত করিয়া ছাত্রদের পড়াইলাম যে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপরে পড়িয়া চন্দ্র গ্রহণ হয়। তাহারা তা পড়িল, লিখিল, নম্বর পাইল, পাশ করিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হইল যখন আবার সত্যি সত্যি চন্দ্রগ্রহণ হইল তখন চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিয়াছে বলিয়া তাহারা ঢোল, করতাল, শঙ্খ লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। ইহা এক আশ্চর্য ভারতবর্ষ।"**

এবারেও প্রিন্টেড, ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে জ্যোতিষীরা সহ কুসংস্কারের বিভিন্ন প্রচারকেরা মানুষের মগজ ধোলাই করার জন্য জোর কদমে প্রচার চালিয়েছিলেন। যেমন *পূর্ণিমা চন্দ্র গ্রহণের এক বিরল সংমিশ্রণ, গোটা দুর্গাপুজো জুড়েই বিপদের। *বহু বছর পর চন্দ্র গ্রহণের সঙ্গেই শনি বক্রী, বড় ঠাকুরের কৃপায় দেদার উন্নতি তিন রাশির। *চন্দ্র গ্রহণের দিনেই রাশিচক্র কাঁপাবে শনি, বিপরীত মুখী গতিতে বিরল যোগ ভাগ্যে। *বছর শেষের এই চন্দ্র গ্রহণে কাটবে ভাগ্যের গ্রহণ, পুজোর আগেই ধন যশে উন্নতি হবে কোন পাঁচ রাশির। *বছর শেষের শেষ চন্দ্রগ্রহণে সতর্ক থাকুন বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলারা, সন্তানদের মঙ্গল কামনায় বিভিন্ন নিদান ইত্যাদি। কিন্তু এবার সেই প্রচার তেমন কাজে লাগে নি। বিজ্ঞান সংগঠনগুলোর লাগাতার প্রচারে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে প্রচলিত কুসংস্কারকে সরিয়ে রেখে বহু মানুষ হয় পরিবারের সাথে নয়তো পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে চা বিস্কুট সহযোগে আড্ডার মেজাজে একসঙ্গে মহাজাগতিক দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইলেন। বিভিন্ন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংগঠনের পাশাপাশি কলকাতা জেলা প্রশাসন, একাধিক স্কুল এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষ এই মহাজাগতিক দৃশ্য দর্শনের আয়োজন করেছিল। অনেক জায়গায় খালি চোখে আবার অনেক জায়গায় টেলিস্কোপের সাহায্যে লাল চাঁদ দেখেছেন ছোট থেকে বড় বহু মানুষ।

যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রসার ও বিজ্ঞান চেতনা গঠনের ফলে ব্লাড মুন নিয়ে মানুষের এই প্রবল উৎসাহ বিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম সাফল্য। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রামের মাধ্যমে এই সাফল্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা বদ্ধপরিকর। ■

পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ

প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার প্রযুক্তি কি প্লাস্টিক দূষণের অবসান ঘটাবে?

– গার্গী মজুমদার

১৯৭৩ সাল থেকে জাতি সঙ্ঘের আহ্বানে প্রতি বছর ৫ই জুন নির্দিষ্ট কর্মসূচীকে সামনে রেখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। সেই মতো ২০২৩ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের বিষয় ছিল 'প্লাস্টিক দূষণের সমাধান'। আবার এই বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়টি হল 'প্লাস্টিক দূষণের অবসান'। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে দুই বছরের অন্তরে একই বিষয়ের উপর মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করার কর্মসূচী গ্রহণ করার কারণ কী? তাহলে কি ২০২৩ সাল থেকে প্লাস্টিক দূষণ দূরীকরণের বৈজ্ঞানিক সমাধান গ্রহণ করা হয়নি? নাকি প্লাস্টিক দূষণ অবসানের কোন কার্যকরী পদক্ষেপ এতদিন প্রয়োগ করা হয়নি? তাহলে গত দুই দশক ধরে প্লাস্টিক দূষণের দায়ভার কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে এত ঢক্কানিনাদ কোন উদ্দেশ্যে? এর জবাব লুকিয়ে আছে মূলত দুটি প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তরের উপর। ১) প্লাস্টিক দূষণ বর্তমানে কোন পর্যায়ে রয়েছে ? ও ২) প্লাস্টিক দূষণ অবসানের লক্ষ্যে যে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে তা দূষণ অবসানের লক্ষ্যে নাকি অন্য কোন লক্ষ্যে?

প্লাস্টিক উৎপাদনের চিত্র একনজরে

গত প্রায় একশ বছর ধরে পৃথিবীতে প্লাস্টিকের অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন, ব্যবহার, প্রকৃতিতে বেলাগাম নিক্ষেপ ও প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধের কোনো কার্যকরী বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ফলে আজ এভারেস্টের চূড়া থেকে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ সর্বত্র প্লাস্টিক দূষণের কবলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বা তার পূর্ববর্তী সময়ে কৃত্রিম পলিমার বা প্লাস্টিক ব্যবহারের ক্ষেত্র ছিল খুবই সীমিত। সেই সময় মোটর গাড়ীর টায়ার, মিলিটারীতে যুদ্ধের নানারকম উপকরণ যেমন, যুদ্ধাস্ত্র, তাঁবু, জ্যাকেট, জুতো, বুলেট প্রুফ পোশাক ইত্যাদিতে কৃত্রিম ও আধা-কৃত্রিম পলিমারের ব্যাপক ব্যবহার হত। মূলতঃ সামরিক প্রয়োজনে প্লাস্টিকের ব্যবহার ছিল সীমিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা বিশ্বে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিকের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয় ফলে বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক উৎপাদনে জোয়ার আসে ও প্লাস্টিক শিল্প অতি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্লাস্টিক শিল্পের বিকাশের জন্য মানুষকে প্লাস্টিক ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়। ফলস্বরূপ, ১৯৫০ সালে পৃথিবীতে প্লাস্টিক উৎপাদনের মোট পরিমাণ যেখানে ছিল মাত্র ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন, ২০২৩ সালে অর্থাৎ যে বছর রাষ্ট্র সঙ্ঘ আহূত পরিবেশ দিবসে বিশ্বকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে আহ্বান জানিয়েছিল সেই বছর প্লাস্টিকের মোট উৎপাদন ছিল ৪১.৫ কোটি মেট্রিক টন। আর এই বছর অর্থাৎ 'প্লাস্টিক দূষণের অবসান' করার ঘোষণার বছরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৪৫ কোটি মেট্রিক টন। অর্থাৎ গত ৭৫ বছরে প্লাস্টিক উৎপাদন প্রায় ৩০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘোষণা যাই করা হোক না কেন এই তথ্য থেকে পরিষ্কার যে উৎপাদন হ্রাস করে আগামীদিনে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার কোন পরিকল্পনা সরকার বা উৎপাদকদের নেই। তাই আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশের সরকারের পক্ষ থেকে প্লাস্টিক উৎপাদনের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় নি এমনকি নিষিদ্ধ প্লাস্টিক উৎপাদকদের কোন শাস্তি জরিমানা হয়েছে এমন শোনা যায় নি। অন্যদিকে প্লাস্টিক রিসাইক্লিনের আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ফলে প্লাস্টিক বর্জ্য ক্রমাগত মহার্ঘ্য হয়ে পড়েছে। পরিত্যক্ত প্লাস্টিককে পাইরোলাইসিস প্রক্রিয়ায় রিসাইক্লিং করে জ্বালানীতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে নিযুক্ত বৃহৎ কোম্পানীগুলি এই লাভজনক ব্যবসায় বিশাল পুঁজি নিয়োগ করছে।

প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধে তিন 'আর'-এর দাওয়াই

এখন দেখা যাক বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকেরা প্লাস্টিক দূষণ অবসানের লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে? এই বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে প্লাস্টিক দূষণ অবসানের জন্য রাষ্ট্র সঙ্ঘ 'তিন আর (Three 'R') পদক্ষেপ গ্রহণ করার ঘোষণা করেছে ১) **রিডিউস** অর্থাৎ ব্যবহার হ্রাস করা, ২) **রিইউজ** অর্থাৎ একই প্লাস্টিক দ্রব্যক একাধিক বার ব্যবহার করা এবং ৩) **রিসাইক্লিং** অর্থাৎ রাসায়নিক বা ভৌত প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পুনর্ব্যবহার করা। তাদের ধারণা অনুযায়ী এইভাবে প্লাস্টিক দূষণের অবসান ঘটবে। বিশ্ববাসীকে এটা বোঝানোর লাগাতার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে যে প্লাস্টিক দূষণ অবসানের লক্ষ্যে এগুলোই হল সবচেয়ে কার্যকরী বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ। এই পরিস্থিতিতে সঠিক ধারণায় পৌঁছতে গেলে বিষয়টির গভীরে যাওয়া দরকার।

প্রথমেই বুঝে নিতে হবে, তিনটি 'আর'-এর পরামর্শ কিন্তু সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে, প্লাস্টিক শিল্পের সাথে যুক্ত বৃহৎ

বহুজাতিক কোম্পানীগুলির উদ্দেশ্যে নয়। **'রিডিউস'** বলতে সাধারণ ব্যবহারকারীদের প্লাস্টিকের দ্রব্যাদির ব্যবহার কম করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্লাস্টিক ক্রয় করতে নিষেধ করা হয়েছে ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ বেশি বেশি **'রিইউজ'** করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একবার ব্যবহার করে ফেলে দিতে হয় এমন প্লাস্টিক দ্রব্য (একব্যবহার্য্য) ব্যবহার করতে বারণ করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র হল এই ঘোষণার আগে থেকেই নিম্ন বা উচ্চ যে মানেরই প্লাস্টিক হোক না কেন সাধারণ মানুষ একবার ব্যবহার করে সাধারণত তা ফেলে দেয় না, বিশেষ করে বাজার থেকে ক্রয় করে আনা প্লাস্টিক দ্রব্য। তাহলে প্রশ্ন হল রাষ্ট্র সঙ্ঘের পরমার্শ মতো প্লাস্টিকের ব্যবহার মানুষ কমিয়ে আনলে মালিকদের মুনাফা কী করে হবে? উৎপাদনে লাগাম টানার পথে তারা তো হাঁটবে না। ২০২৩ সালে প্লাস্টিক শিল্পের বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক আয়তন ছিল প্রায় ৭১ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। বর্তমান বিশ্বের মৃতপ্রায় মুনাফাভিত্তিক অর্থনীতির ধারক ও বাহকেরা প্লাস্টিক দূষণ প্রতিকারের জন্য এই সুবিশাল বাজারকে বিসর্জন দেবে তা আশা করা যায় না। বরং ২০৩৩ সাল নাগাদ এই শিল্পের মালিকেরা ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে ১০৫ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। তাই রাষ্ট্র সঙ্ঘের পরামর্শকে মান্যতা দিতে হবে আবার মুনাফা হ্রাস হবে না এমন এক পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যেই তারা এই পলিসি তৈরী সম্পূর্ণ করেছে তা অতি দ্রুত গতিতে লাগু হচ্ছে।

প্লাস্টিক উৎপাদকদের পোয়াবারো

এই পলিসি মেনে বর্তমানে প্লাস্টিক উৎপাদকেরা কিছু বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকপণ্যের উৎপাদন কমিয়ে এনেছে বা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে এই কারণ দেখিয়ে যে ঐ প্লাস্টিকগুলি বেশি দূষণ ঘটায়। সেগুলি হল পলিস্টাইরিন, এক্সপান্ডেড পলিস্টাইরিন বা থার্মোকল, বায়ু-জারণক্ষম পলিমার ইত্যাদি ও সেগুলি দিয়ে প্রস্তুত করা বিভিন্ন একব্যবহার্য্য দ্রব্য যেমন কাপ, প্লেট, বোতল ইত্যাদি। উক্ত দ্রব্যগুলির দৈনন্দিন চাহিদা অত্যাধিক, পাশাপাশি সস্তা হওয়ার কারণে বাজারে বিক্রির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। এই পণ্যগুলির ব্যবহারের মাত্রা ও ব্যবহারিক মূল্য বেশি হলেও দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কারণে এগুলোই আবার মোট প্লাস্টিক বর্জ্যের অধিকাংশটাই দখল করে আছে। এর সমাধান হিসাবে থার্মোকলের পরিবর্তে বাজারে আনা হয়েছে পলিপ্রোপিলিন দ্বারা নির্মিত কাপ, প্লেট, ব্যাগ ইত্যাদি। এগুলি বহুব্যবহার্য্য হওয়ার পাশাপাশি অত্যন্ত লাভজনক কারণ এর বাজারী মূল্য ও রিসাইক্লিং মূল্য বেশি হওয়ায় উৎপাদকেরা উভয়দিকে মুনাফা কামাতে পারে।

এবার আসা যাক রিসাইক্লিং বা পুনর্ব্যবহার প্রসঙ্গে। প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের মূলতঃ তিন রকম প্রযুক্তির প্রচলন আছে। ১) প্রথাগত প্রযুক্তি, যার মধ্যে প্রধান হল যান্ত্রিক উপায়ে প্লাস্টিক মোল্ড করা, মুক্ত জায়গায় প্লাস্টিক পুড়িয়ে দেওয়া ও জমি ভরাট করা। ২) নতুন প্রযুক্তি, যার মধ্যে প্রধান হল, পাইরোলাইসিস, প্লাস্টিক ব্লেন্ডিং ইত্যাদি। ৩) জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে জীবাণুর সাহায্যে প্লাস্টিককে অন্য প্রয়োজনীয় পদার্থে পরিণত করা। উক্ত রিসাইক্লিং প্রযুক্তিগুলির মধ্যে পাইরোলিসিস পদ্ধতি অত্যন্ত লাভজনক। এই প্রযুক্তিতে পলিমারকে বায়ুশূন্য স্থানে উচ্চ তাপ প্রয়োগে তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানীতে পরিণত করা হয়। অর্থাৎ যে জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে প্লাস্টিকের উৎপত্তি, প্লাস্টিককে পুনরায় সেই জ্বালানীতে রূপান্তর করা। অন্যান্য প্রযুক্তিগুলির থেকে এই পদ্ধতিতে ঝামেলা কম ও অত্যন্ত মুনাফাদায়ী। তাই পেট্রোলিয়াম শিল্পের মালিকরা যারা প্লাস্টিক উৎপাদনের সাথে যুক্ত তারাই আবার বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের ব্যবসায় পুঁজি নিয়োগ করছে। রিসাইক্লিং করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন, কম্প্রেসার মেশিন, মোল্ডিং মেশিন, পাইরোলিসিস প্ল্যান্টের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিকসহ যন্ত্রপাতি, মাইক্রোওয়েভ প্ল্যান্টের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদির এক বিশাল বাজার সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বজুড়ে। ২০২২ সালে সারা বিশ্বে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৩৫.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ব্যবসা হয়েছে। ২০২৬ সাল পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৪২.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এতদিন ধরে যে নিত্য ব্যবহার্য্য প্লাস্টিকগুলি বাজারে বিকোচ্ছিল, রাষ্ট্রসঙ্ঘ সেগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করে দিয়েছে – **ভালো প্লাস্টিক** ও **খারাপ প্লাস্টিক**। ভালো প্লাস্টিক অর্থাৎ যে প্লাস্টিকগুলি কম দূষণ ঘটায় আর খারাপ প্লাস্টিক বলতে যা বেশি দূষণ ঘটায়। তাই খারাপ প্লাস্টিক উৎপাদন বন্ধ করে ভালো প্লাস্টিক উৎপাদন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই ঘোষণা থেকে আপাতভাবে তাদের পরিবেশপ্রেমী চরিত্র প্রকাশ পেলেও বিষয়টা একেবারেই তা নয়। আসলে ভালো ও খারাপ প্লাস্টিক এই শ্রেণীবিন্যাস পুনর্ব্যবহার প্রযুক্তিতে মুনাফা সৃষ্টির পরিমাণের উপর নির্ভর করে করা হয়েছে। যে প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার (মূলতঃ পাইরোলিসিস) পদ্ধতি অত্যন্ত লাভজনক সেগুলিকে ভালো প্লাস্টিক যেমন বিভিন্ন ঘনত্বের পলিথিন, পলিপ্রোপিলিন ইত্যাদি। আর যেগুলি লাভজনক নয় বা কম লাভজনক সেগুলিকে খারাপ প্লাস্টিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন পলিস্টাইরিন, পিভিসি, পিইটি ইত্যাদি। পাইরোলিসিস প্রক্রিয়ায় কিছু বহুল ব্যবহৃত প্লাস্টিক হতে প্রাপ্ত পদার্থ ও তার ব্যবহার –

	প্লাস্টিকের নাম	পাইরোলাইসিস প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পদার্থ	প্রাপ্ত পদার্থের ব্যবহার	প্রাপ্ত জ্বালানীর ওজনগত শতকরা প্রাপ্তি
১	পলিপ্রোপিলিন	গ্যাসীয় ও তরল হাইড্রোকার্বন প্রোপিলিন, মোম ইত্যাদি	মূলত জ্বালানী হিসাবে, পুনরায় প্লাস্টিক উৎপাদনে	৮৫-৯৫%
২	পলিইথিলিন	গ্যাসীয় ও তরল হাইড্রোকার্বন, ইথিলিন, মোম ইত্যাদি	মূলত জ্বালানী হিসাবে, পুনরায় প্লাস্টিক উৎপাদনে	৮০-৮৫%
৩	পলিস্টাইরিন বা থার্মোকল	বেঞ্জিন, টলুইন, অন্যান কিছু হাইড্রোকার্বন, নিম্ন মানের তেল	রাসায়নিক শিল্পে ও জ্বালানী হিসাবে	৬০-৭০%
৪	পলিভিনাইল ক্লোরাইড	হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস	পাইরোলিসিস লাভজনক নয়, তাই উৎপাদকদের উৎসাহ নেই।	
৫	পলিইথিলিন টেরিথ্যালেট (পিইটি)	কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড	পুনরায় প্লাস্টিক উৎপাদনে, পাইরোলিসিস লাভজনক নয়।	

এই কারণে ইদানীং পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে নিযুক্ত বৃহৎ কোম্পানীগুলি পলিপ্রোপিলিন উৎপাদনে আদা জল খেয়ে নেমে পড়েছে। রিলায়েন্স, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস, ইন্ডিয়ান অয়েল, ওএনজিসি সহ অন্যান্য বহু ছোট বড় কোম্পানী যারা এতদিন অন্যান্য প্লাস্টিক উৎপাদনে যুক্ত ছিল, ইদানীং পলিপ্রোপিলিন উৎপাদনে নেমে পড়েছে। অন্যদিকে মানুষকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ভালো প্লাস্টিকের সামগ্রী ক্রয় করার জন্য। অর্থাৎ 'ভালো' প্লাস্টিক যখন বর্জ্যে পরিণত হবে তা অধিক মুনাফাদায়ী হয়ে উঠবে। উৎপাদকরা যাতে উৎপাদন ও পুনর্ব্যবহার উভয়দিকে মুনাফা কামাতে পারে তার জন্য এর থেকে সুষ্ঠ ব্যবস্থা আর কী হতে পারে?

সাত মণ তেল পুড়ল, রাধা কিন্তু নাচল না

প্লাস্টিকের দূষণের বর্তমান চিত্র খুবই ভয়ঙ্কর। সারা বিশ্বে প্রতিবছর ৪০ কোটি টন প্লাস্টিক বর্জ্যে পরিণত হয়। বর্তমানে তার মাত্র ৯% রিসাইক্লিং করা সম্ভব হচ্ছে। নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও এর একটা ভালো অংশ পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। বেশ কিছু বর্জ্য নীচু জমি ভরাট করার কাজে ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয় হল ৪৩% প্লাস্টিক বর্জ্যের উপর ব্যবস্থাপকদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে প্রতিবছর ১.৯-২.৩ কোটি টন প্লাস্টিক বিভিন্ন উন্মুক্ত জলাধারে যেমন পুকুর, নদী ও সমুদ্রে এসে জমা হচ্ছে এর মধ্যে প্লাস্টিকে ব্যবহৃত হয় এমন ৪.২ লক্ষ টন বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য জলে মিশছে প্রতিবছর। এই দূষণ পৃথিবীর মাটি ও জলকে বিষময় করে তুলছে প্রতিনিয়ত। প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে এই রাসায়নিক ও প্লাস্টিক বিয়োজনের ফলে সৃষ্ট মাইক্রোপ্লাস্টিক জনজীবনে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে চলেছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে দেশে দেশে যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মহাযজ্ঞ চলছে প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে তা অকার্যকরী প্রমাণ হচ্ছে। কারণ গৃহীত পদক্ষেপগুলি পালিত হলে প্লাস্টিক রিসাইক্লিং-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে কিন্তু দূষণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবে। তাই, **দূষণ অবসানের ফাঁকা বুলির আড়ালে রয়েছে বৃহৎ পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর কোষাগারে মুনাফার পাহাড় জমিয়ে দেবার সুগভীর চক্রান্ত।** রাষ্ট্র সঙ্ঘের গৃহীত পদক্ষেপগুলি পেট্রোলিয়াম কোম্পানীগুলির এই স্বার্থকে সুনিশ্চিত করেছে।

তাহলে দূষণের বৈজ্ঞানিক সমাধান কী?

প্লাস্টিক বিজ্ঞানের এক অভাবনীয় আবিষ্কার। এর বহুমাত্রিক ব্যবহার জীবনে প্রশ্নাতীতভাবে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে। দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিকের গুরুত্ব এতটাই যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্লাস্টিকহীন সমাজ কল্পনা করাটাও অবৈজ্ঞানিক। অথচ মুনাফার তাগিদে এর অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ও ব্যবহার জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সমাজের পরিচালকেরা এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান করার বদলে মালিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে প্লাস্টিক দূষণের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সমাধান করতে হলে প্রথমেই ১) সারা বিশ্বের প্লাস্টিক উৎপাদনে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ন্যূনতম স্তরে নামিয়ে আনতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর প্লাস্টিকের উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। ২) দীর্ঘদিন ধরে প্রকৃতিতে যে প্লাস্টিক জমা হয়েছে তা অতিদ্রুত মুক্ত করতে হবে। এর প্রকৌশল প্রযুক্তিবিদরা ইতিমধ্যে উদ্ভাবন করেছে। এই প্রযুক্তি

যা বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সীমিত আকারে প্রয়োগ করা হচ্ছে তা সর্বত্র চালু করতে হবে। ৩) আগামীতে যাতে প্লাস্টিক জঞ্জাল সৃষ্টি না হয় তার জন্য বৈজ্ঞানিক বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা লাগু করতে হবে। এই ব্যবস্থা গার্হস্থ্য স্তর পর্যন্ত নিশ্চিত করতে হবে। ৪) এই ব্যাপারে যথাযথ আইন জারী করতে হবে যা শিল্প মালিকদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। ৫) সকল মানুষকে দূষণমুক্ত পানীয় সরবরাহ করতে হবে ও তাতে মাইক্রোপ্লাস্টিক-এর অনুপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। ■

কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর বিচার চলিতেছে!

সম্প্রতি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে কোন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে সেই বিষয়ে একদল বিজ্ঞানী ও পরিবেশবাদীরা দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছেন। বিতর্কেল মূল বিষয়টি হইল গ্যাসটি ক্ষতিকারক নাকি নিরীহ। সম্প্রতি মার্কিন পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা ইপিএ ঘোষণা করিয়াছে যে তাহারা ঐ গ্যাসকে আর 'দূষণকারী' অপবাদ দিতে নারাজ। ঐ সংস্থার বিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন যে তাহারা দীর্ঘ চিন্তাভাবনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে গ্যাসটিকে গ্রীনহাউস গ্যাস হিসাবে কলঙ্কিত করিবারও কোন অর্থ নাই। তাহারা ঐ দেশের জাতীয় মহাসাগরীয় ও বায়ুমন্ডলীয় প্রশাসন (এনওএএ)-এর নিকট কার্বন ডাই-অক্সাইড'কে দূষণকারী গ্যাস তালিকা হইতে অব্যাহতি দেওয়ার আর্জি জানাইয়াছেন। শিল্প-কারখানা হইতে কার্বন নিঃসরণের মাত্রাকে সঠিক সীমায় রাখিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া 'বেচারা' গ্যাসটিকে অপবাদ মুক্ত করিবার কথা ঐ আর্জিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। স্মরণ করা যাইতে পারে ২০০৭ সালে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায়দানকে মান্যতা জানাইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসটির উপর খাড়া নামিয়া আসিয়াছিল ও তাহাকে 'বায়ুমন্ডলের বিষ' বলিয়া দাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অতীতে শিল্প বিপ্লবের সময়কাল হইতেই বায়ুমন্ডলে ঐ গ্যাসটির বাড় বাড়ন্ত বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ বলিয়া একটি তত্ত্বের জন্ম হইয়াছিল। বিগত চার দশক ব্যাপিয়া সেই তত্ত্বে বারি সিঞ্চন করিয়া তাহাকে ক্রমশ জনপ্রিয় ও মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য করিবার প্রয়াস জারি রাখা হইয়াছে। তাহাকে 'বিষাক্ত' আখ্যা দিয়া বিগত দুই দশক ব্যাপিয়া বিশ্বব্যাপী বহুবিধ ব্যবসা-বাণিজ্য ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে এমনই মহার্ঘ্য গ্যাসটির 'দূষণকারী' অপবাদ ঘুচিয়া যাইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের কী হইবে? নাকি অপবাদ ঘুচিলে কেহ কেহ লাভবান হইবেন? বাদী পক্ষের এ হেন আবদারের হেতু কী? বিবাদী পক্ষের পরিবেশ সংস্থাগুলি উক্ত বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোক সম্পাত করিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে কতিপয় শিল্পগোষ্ঠীর চাপ প্রয়োগেই ইপিএ তথা ট্রাম্প প্রশাসন এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করিবার জন্য আর্জি জানাইয়াছে। ট্রাম্প প্রশাসন জানাইয়াছে যে জো বাইডেন পরিচালিত পূর্বতন মার্কিন প্রশাসনের আমলে শিল্প-কারখানায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের নিঃসরণ মাত্রা যাহা বলবৎ হইয়াছিল তাহা দেশের অর্থনীতিতে সুবিশাল ক্ষতি সাধন করিয়াছে। উক্ত নিঃসরণ মাত্রার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকিলে আগামীদিনেও ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে এমনই আশঙ্কা করা হইয়াছে। এই আর্জি যাহাতে গৃহীত না হয় তাহার জন্য অপর পক্ষ সুপ্রিম আদালতে মামলা করিয়াছে। ফলস্বরূপ, কার্বন ডাই-অক্সাইড এর ভবিষ্যৎ এখন আদালতে বিচারাধীন। ফলাফল কি হইবে তাহা লইয়া উত্তেজনার কোনো শেষ নাই। এদিকে ঘটনার গভীরে ঘটিতেছে অন্য এক ঘটনা। ক্রমশ প্রকাশ পাইতেছে যে উক্ত আইনী লড়াইয়ের নেপথ্যে রহিয়াছে দুইটি মহৎ শিল্পগোষ্ঠীর লড়াই। যাহারা গ্যাসটির অপবাদ ঘোচাইতে বদ্ধপরিকর তাহারা জীবাশ্ম জ্বালানির পক্ষ অবলম্বন করিতেছে। অপরদিকে যাহারা গ্যাসটিকে দূষণকারী বলিতেছে তাহারা সবুজ বা পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির সমর্থনে অবস্থান করিতেছে। বোঝা যাইতেছে এই মামলার রায় যাহাই হইক না কেন তাহা বৈজ্ঞানিক সত্যতাকে সম্মুখে আনিতে সমর্থ হইবে না। বহু পূর্বেই বিজ্ঞানীকূল কার্বন ডাই-অক্সাইড'কে একটি নিরীহ গ্যাস বলিয়াছেন। বায়ুমন্ডলে এই গ্যাস না থাকিলে প্রাণের সৃষ্টি ও তার অস্তিত্ব রক্ষা হইত না। ইহা গ্রীনহাউস গ্যাসের ভূমিকা পালন না করিলে পৃথিবী প্রাণী ও উদ্ভিদকূলের পক্ষে বাসযোগ্য হইত না। প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে যাহা রহিয়াছে, রক্তে দ্রবীভূত হইয়া যাহা শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সর্বদা প্রবাহিত হইতেছে, যাহা প্রতিটি হৃদস্পন্দনে রহিয়াছে তাহাকে 'বিষ' বলিয়া দাগাইয়া দেওয়া কেবল অবৈজ্ঞানিক নহে বরং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বায়ুমন্ডলে ইহার পরিমাণ কার্বনচক্র দ্বারা সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এইসকল বৈজ্ঞানিক সত্য কাহারও অজানা নহে, তথাপি ইহাকে লইয়া বিবাদ থামিতেছে না। যতদিন মুনাফা ভোগীরা সচল থাকিবে, ততদিন এই বিবাদ থামিবার নহে। আপাতত ইহাকে বারে বারে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হইবে। ■

গল্পের ছলে বিজ্ঞান ঃ

ডারউইনের আলোয়

– পঞ্চানন মন্ডল

ডারউইন দিবস। কলেজ অডিটোরিয়ামের বাইরে করিডরে ছোট এক বিজ্ঞান প্রদর্শনী। দেয়ালে টাঙানো – ডারউইনের ছবি, বিবর্তনের নানা চার্ট আর টেবিলে বিভিন্ন জীবাশ্মের মডেল। একটা শোকেসে রাখা হয়েছে *'On the Origin of Species'* বইয়ের একটি ছেঁড়া পুরোনো সংস্করণ। চারদিকে ছাত্রছাত্রীদের ভিড়। তবে এদিকে এক কোণে দাঁড়িয়ে প্রিতম মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে বইটির দিকে।

প্রফেসর মিত্র করিডোর দিয়ে হেঁটে অডিটোরিয়ামের দিকে যাওয়ার পথে প্রিতমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাশে এগিয়ে গিয়ে বললেন – প্রিতম, এখানে দাঁড়িয়ে কী ভাবছো? আর তুমি তো দেখছি একেবারে মোহিত হয়ে গেছো!

প্রিতম বলল – স্যার, এই বইটা কি আসল কপি?

– আসলে এই বইটি খুব প্রাচীন একটা সংস্করণ। অনেক সংগ্রাহকই রাখেন। আমাদের কলেজের অধ্যাপক ড. সমীরণ হালদার স্যার এটি দিয়েছেন, তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে।

– কী আশ্চর্য! তাই না স্যার! একটামাত্র বই – কিন্তু মানুষের চিন্তা চেতনা কীভাবে বদলে দিল!

– হ্যাঁ রে, সত্যি সত্যি এই বইটিই তো একসময় অনেকের ভাবনার ধারাটাই ঘুরিয়ে দিয়েছিল। একসময় প্রত্যেকে ভাবত, জীবন ঈশ্বরের সৃষ্টি, এমনকি মানুষও। কিন্তু ডারউইন এসে বললেন – না, জীবন ও নতুন জীব সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির নিয়মে।

– কিন্তু স্যার, তাহলে কি জীবন একেবারেই কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া তৈরি হয়েছে?

– আসলে এই প্রশ্নটাই তো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। আজ ১২ ফেব্রুয়ারি 'ডারউইন দিবস' বলে আমরা যেটা উদ্‌যাপন করছি, সেটা শুধু ঈশ্বর-বিরোধী যুক্তি নয়, বরং এক ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিজয়। ডারউইন বলেছিলেন – জীবন, তার বৈচিত্র্য, তার গঠন, তার টিকে থাকা, তার ধারাবাহিকতা – সবই এক দীর্ঘ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ফল।

– তাহলে স্যার, আপনি বিশ্বাস করেন না যে জীবনের উৎপত্তি বা বিবর্তনের নেপথ্যে কোনো চেতনা বা পরিকল্পনা ছিল?

প্রফেসর মিত্র এগিয়ে গিয়ে একটি জীবাশ্মের মডেলের দিকে তাকিয়ে বললেন – বিজ্ঞান বিশ্বাস করার ব্যাপার না। বিজ্ঞান চায় প্রমাণ। দেখো এই ট্রিলোবাইটের জীবাশ্মটা – ৩০ কোটিরও বেশি বছর আগের। তখন মানুষ ছিল না, ঈশ্বরের কল্পনাও ছিল না, শুধু ছিল প্রকৃতি আর তার নিয়ম। বিজ্ঞান সেই প্রকৃতির নিয়মগুলো জানার চেষ্টায় আছে।

– স্যার, একটা প্রশ্ন করব?

– করো। তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি আজ তুমি শুধু প্রশ্ন নয়, জ্ঞানের ক্ষুধা নিয়ে এসেছো! বলো, কী নিয়ে ভাবছো?

– স্যার, আপনি বারবার বলেন, ডারউইন জীবনের রহস্য অনেকটাই বুঝে গিয়েছিলেন। কিন্তু জীবন তো এত সহজ নয়! কেউ বলেন ঈশ্বরের সৃষ্টি, কেউ বলেন আত্মা আছে, কেউ আবার বলেন – সবই কেমিস্ট্রি। তাহলে ডারউইন কোথায় দাঁড়িয়ে?

– খুব ভালো প্রশ্ন। তুমি যা বললে, এটাই আজকের মূল দ্বন্দ্ব। আসলে, ডারউইনের সবচেয়ে বড় অবদান কী জানো? তিনি জীবনের বৈচিত্র্য ও বিকাশকে ঈশ্বরীয় বা অলৌকিক ব্যাখ্যার বাইরে এনে ভৌত ও প্রাকৃতিক নিয়মের আলোকে দেখতে শিখিয়েছিলেন।

– তাহলে ডারউইন কি বিশ্বাস করতেন যে জীবনের নেপথ্যে কোনো উচ্চতর পরিকল্পনা নেই?

– একদম। ডারউইনের কাছে জীবন ছিল না কোন অলৌকিক ব্যাপার বা কোন মহাজাগতিক দুর্ঘটনা বরং, এটা এক প্রবহমান প্রক্রিয়া – যেমন নদী বয়ে চলে, পাহাড় মালভূমি সমতল ভেঙে নিজের পথ তৈরি করে। আর জীবনের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই। তবে এটা তাঁর শুধু বিশ্বাস ছিল না, এর স্বপক্ষে বহু প্রমাণ তিনি দেখিয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ, জীবাশ্ম ঘটিত প্রমাণ। তিনি বলেছেন পৃথিবীতে এই বিপুল জীবজগৎ ও তার অসাধারণ বৈচিত্র্য একদিনে সৃষ্টি হয়নি। প্রথমে কোনোভাবে এসেছে সরল গঠনের আদিম প্রাণ, ক্রমে বিবর্তনের ফলে তার জটিলতা বেড়েছে, এক রকমের জীব থেকে নানা রকমের জীবনের সৃষ্টি হয়েছে, এসেছে মানুষ। তবে এই বিবর্তনের নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই। এই ধারণাকে বিবর্তনবাদ বলা হয়। চার্লস ডারউইন তাঁর ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত বই On the Origin of Species বইতে প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ উপস্থাপন করেন। তবে তার আগের বছর ডারউইন ও আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস যৌথভাবে 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন' তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন, আমরা আলফ্রেড রাসেলকে মনে রাখি নি!

– স্যার এই প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়ে কিছু বলুন।

– ডারউইনের মতে শুধু ভিন্ন নয়, একই প্রজাতির জীবদের মধ্যেও কিছু প্রাকৃতিক ভিন্নতা বা ভেদ (variation) থাকে যা উত্তরাধিকার সূত্রে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে যায়। প্রতিটি জীব প্রজাতি এত বেশি সন্তান উৎপন্ন করে যে সকলের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হয় না। খাদ্য, আশ্রয়, সঙ্গী ও জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানের জন্য জীবনের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। যেসব জীবেরা অনুকূল ভেদ সম্পন্ন তারা সবচেয়ে ভালোভাবে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তারাই টিকে থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে। তারাই তাদের অনুকূল বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী প্রজন্মে দিয়ে যায়। ফলে ধীরে ধীরে গোটা প্রজাতির মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক নির্বাচনই ধীরে ধীরে নতুন নতুন প্রজাতির জন্ম দেয় এবং জীবজগতের বিবর্তন ঘটায়।

– কিন্তু স্যার, প্রাকৃতিক নির্বাচন তো শুধু ভালো বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে রাখে। কিন্তু সেই বৈচিত্র্যই তো আগে থাকতে হয়! সেটা কোথা থেকে আসে?

– বাহ! দারুন প্রশ্ন করলি! তবে এখানে ভালো-মন্দের বড় হলো সেই অঙ্গ কতটা তার জীবন সংগ্রামে সহায়ক। কতটা তাকে টিকে থাকতে সাহায্য করে! ডারউইন বুঝেছিলেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনের জন্য বৈচিত্র্য থাকা চাই। কিন্তু তিনি জানতেন না ডিএনএ, মিউটেশন, বা জেনেটিক ড্রিফট-এর কথা। সেই ধারণা তখনো আসেনি।

– তাহলে স্যার, ডারউইন ভুল ছিলেন?

– না প্রিতম, তিনি ভুল ছিলেন না, তিনি সীমিত সময়ের মধ্যে এক অসীম সত্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। ডিএনএ বা জিনতত্ত্বের জ্ঞান ছাড়াও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জীবনের বিকাশ কোন পরিকল্পনার ফল নয়, বরং প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব আর পরিবর্তনের গতি।

– আপনি তো বলতেন, 'emergence'-এর কথা – পুরানো জিনিস থেকেই নতুন কিছু জন্ম নেয়?

– একদম! যেমন, জড় বস্তু দিয়ে জীবনের উৎপত্তি, আবার জীবনের মধ্য থেকেই চেতনার উত্থান। সবসময় কিছু একটা গুণগত রূপান্তর হয়। এগুলো কোনো ঈশ্বরের ইচ্ছায় নয়, বরং জটিল প্রাকৃতিক পরিস্থিতি ও সংঘাতের ফল।

– তাহলে স্যার, আমাদের বিশ্বাস, যেমন আমি যদি বলি 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি' বা 'আমি করি না' – তাতে কি বিবর্তনের ওপর কিছু প্রভাব পড়ে?

– আরে না রে! প্রকৃতি আমাদের বিশ্বাসে চলে না। আমরা থাকি বা না থাকি, প্রকৃতি চলবেই। বিবর্তন কোনো 'বিশ্বাসের' বিষয় নয়, বিবর্তন বস্তুনিষ্ঠ প্রক্রিয়া। ঠিক যেমন আগুনে হাত দিলে পোড়ে, বিশ্বাস করলেও, না করলেও পোড়ে।

– তাই যদি হয়, তাহলে আমরা মানে মানুষ? আমরা কি কিছুই না? কেবল ঘটনাচক্রে তৈরি কিছু জৈবিক প্যাকেট?

– ব্যাপারটা এতটাই হালকা নয় প্রিতম। মানুষ প্রকৃতিরই সন্তান। আবার তার ব্যাখ্যাকারিও। ডারউইন বলেছিলেন না, 'It is not the strongest that survive, nor the most intelligent, but the one most adaptable to change.' এই পরিবর্তনশীলতাই জীবন, আর তাকেই বোঝা – এটাই চেতনার জন্ম। এক সময় এই প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ অচেতন, তারপর সেই প্রকৃতির ভেতরেই চেতনা জন্ম নিয়েছে, ধীরে ধীরে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

এটাই ডারউইনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী শিক্ষা – প্রকৃতি নিজের ভিতরেই চেতনার বীজ বহন করে।

– তাহলে আমাদের সমাজ, ইতিহাস, প্রযুক্তি, শিল্প সবই কি সেই বিবর্তনেরই অংশ?

– একদম! মানুষ প্রকৃতিরই একটি ধাপে পৌঁছানো রূপ, যেখানে প্রকৃতি নিজেকে বুঝতে এবং নিজেকে রূপান্তরিত করতে শিখেছে।

– স্যার, ডারউইনের মতে, জীবনের লক্ষ্য কী?

– ডারউইনের মতে প্রাকৃতিক নির্বাচন হলো প্রকৃতির নিজের বেছে নেওয়া এক প্রক্রিয়া, যেখানে সবথেকে মানানসই জীবেরা টিকে থাকে ও ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের বৈশিষ্ট্য রেখে যেতে চায়, সেটাই সেই জীবের লক্ষ্য। কিন্তু আগেই বলেছি বিবর্তনের নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই।

– আচ্ছা স্যার, মানুষ তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জীব!

– বাস্তবে আগেই বলেছি জৈব বিবর্তনের কোন লক্ষ্য নেই! জৈব বিবর্তন এক প্রাণের বিস্ফোরণ বলা যায়, যা মোটেই একমুখী নয়। অনেকেই বিবর্তন সম্পর্কে ভাবে যে, "বিবর্তন সমসময় উন্নততর প্রজাতি তৈরির চেষ্টারত", বলে যে প্রাইমেটরা (মানুষ, শিম্পাঞ্জী, বানর ইত্যাদি) অন্যান্য স্তন্যপায়ী যেমন গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়ালদের তুলনায় "বেশি বিবর্তিত", কিন্তু এই ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। জীববিজ্ঞানে বলা হয় "বিবর্তন অন্ধ।" বিবর্তন যা করে তা হলো কোন জীব প্রজাতিকে তার বর্তমান পরিবেশ এবং জীবনপ্রণালীর সাথে অভিযোজিত করে তোলে। বিবর্তনের কোন উদ্দেশ্য নেই, এবং বিবর্তন কোন ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম নয়। মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জীব এটা মোটেই সত্য না। মানুষ আসলে আলাদা কোন প্রাণী নয়, মানুষ জীবনের বিবর্তনের একটা পর্যায়ে আছে, যদি মানুষ আরও কয়েক লক্ষ বছর টিকে যায় তাহলে আজকের মানুষদের মধ্যে থেকেই দেখতে আলাদা কোন জীবের হয়তো বিবর্তন ঘটবে। সব জীবন বিবর্তনের রাস্তাটিতে যাত্রা করছে, কিন্তু কোন জীব রাস্তায় থেমে নেই, সবাই রাস্তায় দ্রুত বা কম গতিতে

চলমান রয়েছে। বিবর্তন একটি অপ্রতিরোধ্য যাত্রা, কোন জীব কিন্তু বিবর্তনের মূল রাস্তায় টিকবে না, পরিবর্তন হবেই হবে।

– তাহলে জীবন আর কোনো অলৌকিক রহস্য নয়?

– না, জীবন এক ঐতিহাসিক, বস্তুগত, দ্বন্দ্বময় ও গতিশীল প্রক্রিয়া। আর ডারউইনের আসল কৃতিত্ব এই – তিনি জীবনের রহস্যকে ঈশ্বরের অন্ধকার গুহা থেকে বের করে বিজ্ঞানের আকাশে নিয়ে এসেছিলেন।

– স্যার, এতদিন ডারউইনকে শুধু একজন 'বিজ্ঞানী' ভাবতাম। আজ মনে হচ্ছে উনি যেন এক অনন্য দার্শনিক।

– সে কথাটা ঠিকই বলেছিস। তিনি ছিলেন এমন একজন দার্শনিক বা বলা যায় চিন্তাবিদ, যিনি জীবনের গল্পটা ঈশ্বর দিয়ে নয়, নিয়ম, দ্বন্দ্ব আর বস্তু বিকাশের নিয়মের ভাষা দিয়ে লিখেছিলেন।

– স্যার, মনে হচ্ছে জীবনের রহস্য একবারে মিটে গেল না বটে, কিন্তু আলোটা কে জ্বালিয়ে দিলেন, সেটা আজ স্পষ্ট – তিনি চার্লস ডারউইন।

স্যার প্রিতমের পিঠ চাপড়ে বললেন – একদম! আর সেই আলোটা এখন আমাদের হাতে – বোঝার, প্রশ্ন করার, আর দিন বদলানোর।

ডারউইন বুঝেছিলেন, এই নিয়মই ধাপে ধাপে জীবনের গঠন বদলেছে। প্রতিটা স্তরে ঘটেছে এক গুণগত বিবর্তন।

প্রিতম আবার সেই জীবাশ্মের দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু স্যার, আমরা মানুষ – আমরা তো ভাবি, বিশ্বাস করি। আমাদের অনুভব থাকে। তাহলে কি সেটা কেবল জৈব প্রক্রিয়া!

– জৈব, কিন্তু শুধু তাই নয়। মানুষ প্রকৃতির সেই স্তর, যেখানে প্রকৃতি নিজেকে বুঝতে শিখেছে। এই চেতনা এসেছে কোটি কোটি বছরের সংগ্রাম, পরিবর্তন আর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে।

এটা অলৌকিক নয়, বরং emergence – নতুন গুণমানের উদ্ভব, পুরোনো গঠনের ভিতর থেকেই।

– তাহলে কি আমরা প্রকৃতিরই এক উচ্চতর রূপ?

– একদম, প্রকৃতিরই এক উচ্চতর রূপ, কিন্তু শ্রেষ্ঠ জীব নয়। আমরা প্রকৃতিরই সন্তান, আবার তার ব্যাখ্যাকারীও। ডারউইন বলেছিরেন না, "It is not the strongest that survive, nor the most intelligent, but the one most adaptable to change."

এই পরিবর্তনশীলতাই জীবন, আর তাকেই বোঝা – এটাই চেতনার জন্ম।

– স্যার, আমি আজ বুঝলাম, ডারউইনের অবদান শুধু একটি তত্ত্ব নয়, এ এক দৃষ্টিভঙ্গি।

– ঠিক তাই। ডারউইন হয়তো জীবনের সব রহস্য বোঝাতে পারেননি, কিন্তু তিনি জীব সৃষ্টির রহস্যকে ঈশ্বরের ছায়া থেকে টেনে এনেছিলেন বাস্তবের আলোয়। তাঁর সাহস, বিজ্ঞান ভাবনা আমাদের শিখিয়েছে – জীবন কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় এটা পুরোপুরি প্রাকৃতিক।

দু'জনে আবার কাচঘরের দিকে এগিয়ে আসে। প্রিতম মাথা নিচু করে ডারউইনের সেই বইটার দিকে আবারও তাকিয়ে থাকে। প্রফেসর মিত্রর গলায় এক আশ্চর্য নরম দৃঢ়তা। বললেন – মনে রেখো, ডারউইনের আলো নিভে যায় নি – ওটা এখন আমাদের হাতে। আমরা যারা সব কিছু বিশ্বাস করিনা, প্রশ্ন করি, ব্যাখ্যা খুঁজি, বিশ্বাস নয় বিজ্ঞান ও যুক্তির পথে চলি – আমরাই সেই আলো বয়ে নিয়ে চলেছি। ডারউইনের আলো।

কাচের শোকেসে আলোর নিচে রাখা সেই বইটা যেন নিঃশব্দে জ্বলছে, বিজ্ঞানের ইতিহাসের এক অমোঘ শিখা হয়ে ... ■

ব্যক্তিগত চিঠিতে বাইবেল, ঈশ্বর এবং যিশু খ্রিস্ট সম্পর্কে চার্লস ডারউইন

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর, এক ব্যক্তিগত চিঠিতে (তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) চার্লস ডারউইন লেখেন –

মাননীয় মহাশয়,

আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাইতেছি যে আমি বাইবেলকে ঐশ্বরিক উদ্ঘাটন হিসেবে বিশ্বাস করি না এবং তাই যিশু খ্রিস্টকে ঈশ্বর পুত্র হিসেবেও নয়।

আপনার অনুগত
চার্লস ডারউইন

Private
Nov. 24 1880
Dear Sir
I am sorry to have to inform you that I do not believe in the Bible as a Divine revelation, & therefore not in Jesus Christ as the son of God.
Yours faithfully
Ch. Darwin

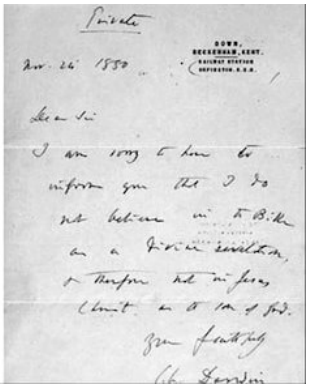

বিশেষ রচনা ঃ

হিমালয় পর্বতমালা
আসন্ন ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি

উত্তর পশ্চিমে জম্মু-কাশ্মীর থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল ভূতাত্ত্বিকভাবে ভয়ানক অস্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গেছে অসংখ্য সক্রিয় চ্যুতিতল। হিমালয় অঞ্চলে ইন্ডিয়ান প্লেট উত্তরপূর্ব দিক বরাবর বছরে ৫-১০ সে.মি সরণ ঘটাচ্ছে ইউরেশিয়ান প্লেটের দিকে। অন্যদিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিক বরাবর ইউরেশিয়ান প্লেট বছরে ৫-৬ সে.মি সরণ ঘটাচ্ছে। এই বিপরীতমুখী বলের কারণে হিমালয়ের অভ্যন্তরে প্রবল স্ট্রেস উৎপন্ন হচ্ছে। ঘটছে স্ট্রেসজাত পীড়ন। এর ফলে জন্ম হয়েছে অসংখ্য চ্যুতিতলের। যেমন মেইন ফ্রন্টাল থ্রাস্ট (MFT), মেইন বাউন্ডারি থ্রাস্ট (MBT)। এই সকল থ্রাস্ট প্লেনগুলি হিমালয়ের গভীরে থাকা মেইন হিমালয়ান থ্রাস্ট (MHT) থেকে সরাসরি আলাদা হয়ে গেছে বিভিন্ন চ্যুতির দ্বারা। এছাড়া লেসার হিমালয়কে গ্রেটার হিমালয় পৃথক করেছে মেইন সেন্ট্রাল থ্রাস্ট (MCT), যা হিমালয়ের ভূতাত্ত্বিক উত্থান (tectonic upliftment) এর জন্য প্রধান দায়ী। এই ফল্ট বা থ্রাস্ট প্লেনগুলি ইন্ডিয়ান প্লেট এবং ইউরেশিয়ান প্লেটের মুখোমুখি সংঘর্ষ, যা গত ৫ কোটি বছর ধরে এই অঞ্চলে চলছে তার প্রত্যক্ষ ফলাফল। এই অঞ্চল প্রবল ভূমিকম্প প্রবণ (জোন ৪ এবং জোন ৫)। ভূতাত্ত্বিকরা বলছেন প্রায় সমগ্র হিমালয় পর্বতমালা (মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত শিলং মালভূমি ছাড়া) টেথিস সাগরের পলি দ্বারা গঠিত। এই পাললিক শিলা প্রচন্ড চাপে এবং তাপে রূপান্তরিত হয়ে ফিলাইস্ট, সিস্ট বা বিভিন্ন নাইস পাথর তৈরি করেছে। যার অধিকাংশই কুঞ্চিত, ফাটলযুক্ত, প্রচন্ড খাড়াভাবে অবস্থানরত এবং ভঙ্গুর। এই অঞ্চলে লাগাতার ভূমিকম্প হয়ে চলেছে। ভূ-আলোড়ণজনিত কারণে প্রবল ভূমিক্ষয়ের সাথে সাথে হিমালয়ের উত্থান হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন (পৃথক রচনায়, ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) সিসমিক গ্যাপ তৈরি হওয়ায় উত্তরাখন্ডে বড় মাত্রার ভূমিকম্প আসন্ন। (চিত্র-১)

হিমালয় থেকে নেমে এসেছে অসংখ্য খরস্রোতা পাহাড়ি নদী, নদীর গিরিখাত অত্যন্ত গভীর। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে সমগ্র হিমলায় ও তার পাদদেশে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের হার বেশি। অধিক উচ্চতার জন্য অনেক সময়ই প্রবল বৃষ্টি এমনকি মেঘভাঙা বৃষ্টি (Cloud Burst) ঘটে থাকে। হিমালয়ের সুউচ্চ স্থানে শতাধিক বরফ হয়ে যাওয়া হ্রদ (Glacial Lake) আছে। ভূমিকম্পের ফলে হ্রদ এবং বরফের চাঙরে ফাটল ধরে, হিমবাহের

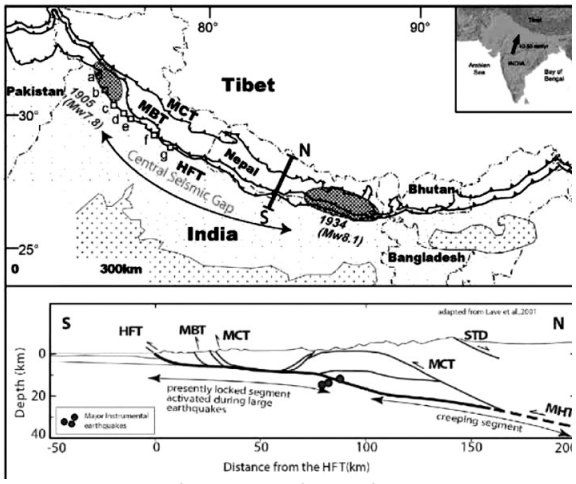

হিমালয়ের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র

অতিরিক্ত গলনের ফলে বা মেঘভাঙা বৃষ্টির প্রভাবে Glacial Lake Outburst (বরফ হ্রদে ভাঙন থেকে বিপর্যয়) ঘটে থাকে।

জঙ্গল এবং খনিজ সম্পদে ভরপুর এই হিমালয় পর্বতমালা তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য বিশ্ববাসীর কাছেই প্রিয়। তাই প্রাচীনকাল থেকেই এখানে পর্যটন শিল্প গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে বিশ্ববিখ্যাত দার্জিলিঙ চা বাগিচা এবং আপেল, কমলালেবুর ন্যায় নানা প্রকার ফলের বাগিচা, অর্কিড।

লাগাতার মেঘভাঙা বৃষ্টি, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, গ্লেসিয়াল আউটবার্স্ট এর মত ঘটনা জম্মু-কাশ্মীর, উত্তরাখন্ড, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, দার্জিলিঙ অঞ্চলে বার বার ঘটতে দেখে; ঘরবাড়ি, হোটেল, ব্রীজ, বাঁধ, রাস্তা ধ্বংস হতে দেখে; বার বার প্লাবনে জান-মাল হারানো মানুষদের দেখে অনেকের মনেই প্রশ্ন – তবে কি হিমালয় ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে? এবছর জম্মু, হিমাচল, উত্তরাখন্ড এবং পাঞ্জাবের প্রবল বন্যা অতীতের রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। ২০১৩-তে কেদারনাথ, ২০২১-এ চামোলি, ২০২৩-এ সিকিম, ২০২৫-এ ধরালি ... বিপর্যয় ঘটেই চলেছে।

ভূতাত্ত্বিকভাবে বিপজ্জনক, ভৌগোলিকভাবে সুউচ্চ এবং খাড়া অঞ্চল, প্রবল বৃষ্টিপাত হয় যেখানে সেই অঞ্চলে বিগত কয়েক দশক ধরে হিমালয়ের প্রাকৃতিক স্থিতিশীলতা, পরিবেশ সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে ভূবিজ্ঞানী, স্থাপত্য বিজ্ঞানী, পরিবেশ

সিকিমে তিস্তাপাড়ে ভূমিধ্বস

বিজ্ঞানীদের লাগাতার সতর্ক বার্তাকে উপেক্ষা করে গড়ে তোলা হচ্ছে নানারূপের অবকাঠামো (infrastructure)। হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে যে প্রকল্পগুলি গড়ে তোলা হচ্ছে তার কয়েকটি হল ঃ ১) চারধাম হাউওয়ে প্রকল্প, উত্তরাখন্ডের চারটি হিন্দু তীর্থস্থান – কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীকে সংযোগকারী ৮৯০ কিমি চার লেনের হাইওয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে ১২ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পে। এর জন্য ৬৯০ হেক্টর জঙ্গল নষ্ট হয়েছে, ৫৫ হাজার বৃক্ষ কাটা হয়েছে, ২০ মিলিয়ন ঘন মিটার মাটি কাটা হয়েছে। এই হাইওয়ে যে পথে তৈরি হয়েছে তার ৯০০ মিটারের মধ্যে ৮১১টি সাম্প্রতিক ধ্বসের ৮১ শতাংশ এখানে হয়েছে।

২) লাদাখ এবং জম্মু-কাশ্মীরের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী জেড নর্থ ও জোজিলা টানেল কাটা চলেছে অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠনকে উপেক্ষা করে।

৩) জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখের সংযোগ রক্ষাকারী অটল টানেল প্রকল্প শুরু হয়েছে।

৪) দার্জিলিঙ জেলার সেবক থেকে সিকিমের রংপো অবধি ৪৫ কি.মি দীর্ঘ টানেল রেলপথ তৈরি চলছে। শুরুতেই টানেলে বিপর্যয়ও ঘটেছে।

৫) সমগ্র হিমালয় জুড়ে শতাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়া হচ্ছে ভূবিজ্ঞান ও স্থাপত্য বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে। এগুলির কয়েকটি হল ঃ

*জম্মু-কাশ্মীরে কিসানগঙ্গা হাইড্রো পাওয়ার প্রোজেক্ট

*হিমাচল প্রদেশে নেফা ঝাকরি হাইড্রো পাওয়ার প্রোজেক্ট

*উত্তরাখন্ডে তপোবন বিষ্ণুগড় হাইড্রো পাওয়ার প্রোজেক্ট

*অরুণাচলে পারে হাইড্রো পাওয়ার প্রোজেক্ট

*সিকিমের তিস্তা৩, তিস্তা৪, তিস্তা৬ হাইড্রো পাওয়ার প্রোজেক্ট

*সিকিমের রঙ্গিত৩, রঙ্গিত৪ হাইড্রো পাওয়ার প্রোজেক্ট ইত্যাদি।

৬) পাহাড়ের প্রায় সর্বত্র গড়ে উঠেছে অপরিকল্পিত, অবৈজ্ঞানিক বহুতল বাড়ি, অসংখ্য সেতু, চওড়া রাস্তা, বৃহৎ বৃহৎ জলাধার।

৭) রাস্তাগুলির প্রস্থ বাড়াতে এবং দৈর্ঘ্য কমাতে খাড়াই অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালকে প্রায় লম্বভাবে ছেদন করা চলছে।

৮) মাটিকে ধরে রাখতে সক্ষম বৃক্ষগুলি ছেদন করে ব্যবসায়িক স্বার্থে এক প্রজাতির বৃক্ষরোপণ (monocrop cultivation) করা হচ্ছে।

৯) পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীর চর এমনকি ছোট ছোট প্রাকৃতিক নালাকে বুজিয়ে বা দখল করে হোটেল, রিসর্ট, বাড়ি বানানো চলছে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে।

১০) খরচ কমাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অবকাঠামোগুলি হিমালয়ের ভূতাত্ত্বিক গঠনকে উপেক্ষা করে গড়া হচ্ছে।

দ্রুত মুনাফা লাভের আশায় বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সমগ্র হিমালয় এবং তার পাদদেশে বৃহৎ বিনিয়োগের নামে যা চলছে তাকে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সীমাহীন লুঠতরাজ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় কি?

এর ফলাফল যা হওয়ার হয়ে চলেছে। লাগাতার ভূমিধ্বস, প্লাবন – মানবসভ্যতার উপর এক বর্বর ধ্বংসলীলা ছাড়া একে অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। আমরা উন্নয়নের বিরোধী নই। উন্নয়নের জন্য পাহাড়, জঙ্গল, সমভূমিতে নগরায়ন, শিল্পায়ন, সভ্যতা বিকাশের পক্ষে। কিন্তু যে উন্নয়ন বিজ্ঞান বিরোধী, এলাকায় ভূতাত্ত্বিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে, ধ্বংস ডেকে আনে আমরা অবশ্যই তার বিরোধী।

শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কোন সভ্য মানুষের কি এই অন্যায়, বিজ্ঞান বিরোধী কর্মকান্ড মেনে নেওয়া উচিত? আন্তর্জাতিক তথা দেশীয় পরিবেশবাদী হাজারো সংগঠন আছে। তারা কি এগুলি প্রত্যক্ষ করছেন না? তবে সেরকম প্রতিবাদ, প্রতিরোধী আন্দোলন কোথায়?

উন্নয়নের নামে এইসব ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের কুফলকে আড়াল করতে জলবায়ু পরিবর্তন এবং মনুষ্যসৃষ্ট বিশ্ব উষ্ণায়নকে এই বিপর্যয়ের জন্য প্রধানভাবে কাঠগোড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে।

সম্প্রতি ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অফ হিমালয়ান জিওলজির গবেষক ডঃ মণীশ মেহতা বলেছেন মনুষ্যসৃষ্ট বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য মৌসুমি বায়ুর উচ্চতাবৃদ্ধি পেয়ে হিমালয় অঞ্চলের জলবায়ুর পবিরর্তন হয়ে গেছে। তিব্বতের জাংস্কার মালভূমিতে (হিমালয় টপকে) মৌসুমি বায়ু পৌঁছে গত ৭০ বছরের মধ্যে সর্বাধিক

বৃষ্টিপাত এবং অকাল বয়ফপাত ঘটিয়েছে। গত ৮০ বছরে তিব্বতে এমন বৃষ্টিপাত হয়নি।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে তথ্য ও যুক্তি ছাড়া মেনে নিয়েও বলা যায় যে, তবে তো ৭০-৮০ বছর আগে তিব্বতের শুষ্ক শীতল মরুভূমিতে এবছরের ন্যায় বৃষ্টিপাত হত। মনুষ্যজনিত কারণে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধিই যদি বিশ্ব উষ্ণায়ন তথা জলবায়ু পরিবর্তনের একমাত্র কারণ হয়ে থাকে তবে তো তা লাগাতার বেড়ে চলার কথা! শিল্প বিপ্লবের পর তার কমা-বাড়া হচ্ছে কেন? অর্থাৎ মনুষ্যজনিত কারণে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের গল্প হাজির করে হিমালয়ের বুকে উন্নয়নের নামে ধ্বংসলীলা চালানোর ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টা চলছে।

গত চার পাঁচ দশকে সমগ্র হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করে দ্রুত মুনাফার উদ্দেশ্যে যে বিজ্ঞান বিরোধী কার্যকলাপ চলছে তাতে ভূতাত্ত্বিকভাবে চরম অস্থিতিশীল হিমালয় এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষ এবং পর্যটকরা এক ভয়ানক বিপর্যয়ের মুখোমুখি।

উত্তরাখন্ডে ভূমিধ্বস

বিজ্ঞান মনস্ক, পরিবেশ প্রেমী, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সকল জনতার কাছে তাই হিমালয়ের বুকে এই ধ্বংসলীলা চালিয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনাকে প্রতিরোধ করার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাই।

উত্তরাখন্ডে ভয়াবহ ভূমিকম্পের সতর্কবার্তা

গত ১০ই সেপ্টেম্বর ২০২৫, টিও ব্লাসকোভিক হিমালয়ের ২৫০ কি.মি দৈর্ঘ্যের অঞ্চলে বিরাট মাত্রার টেকটনিক স্ট্রেস তৈরি হওয়ার কথা জানিয়েছেন যা ভবিষ্যতে উত্তরাখন্ড রাজ্যে ভয়াবহ আসন্ন ভূমিকম্পের আশংকা তেরি করেছে।

এই বিবৃতিতে টিও ব্লাসকোভিক জানিয়েছেন যে উত্তরাখন্ড রাজ্যের ভানাকপুর থেকে দেহরাদুন (২৫০ কি.মি দৈর্ঘ্যের অঞ্চল) অঞ্চলে এক বিরাট মাপের টেকটনিক স্ট্রেস সৃষ্টি হয়েছে। এই গবেষণায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল সেই অঞ্চলে যেখানে ভারতীয় প্লেট ইউরেশিয়ান প্লেটকে বছরে ৫০-৫২ মি.মি (২ ইঞ্চি) ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে।

ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অফ হিমালয়ান জিওলজির মতে এই লকড্ জোন ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে জমা হওয়া স্ট্রেইন (পীড়ন) মুক্ত করেনি। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে গারওয়াল ভূমিকম্পের (রিখটার স্কেলে ৭.৮ মাত্রার) পরে এই কারণে এই নির্দিষ্ট অঞ্চলে তেমন কোন ভূমিকম্প হয় নি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই **২৫০ কি.মি সেগমেন্টে (অঞ্চল) তাই এখন রিখটার স্কেলে ৭-৮ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্প হবার সম্ভাবনা প্রবল।**

প্রায় ২ শতাব্দী পরে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তরকাশীতে ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় ৭০০ মানুষ মারা যান এবং ভূমিকম্পের পর এই অঞ্চল প্রবল ধ্বসপ্রবণ হয়ে পড়ে।

এই প্যার্টান এর পুনরাবৃত্তি ঘটে ঘটে ঐবছরই চামোলির রিখটার স্কেলে ৬.৬ মাত্রার ভূমিকম্পের সময় এবং হাজার হাজার ঘরবাড়ি ভেঙে জনজীবন বিপর্যস্ত করে দেয়।

এই ভাঙনমূলক ঘটনার পরও বিজ্ঞানীরা মনে করছেন সমগ্র উত্তরাখন্ড রাজ্যজুড়ে ভূঅভ্যন্তরে বিরাট পরিমাণ স্ট্রেট জমা হয়েছে।

এই লকড্ জোন (ভূবিজ্ঞানীদের পরিভাষায় নির্দিষ্ট চ্যুতিতল অঞ্চল যেখানে এই অংশের প্রস্তর খন্ডের নিরন্তর বিপরীতমুখী চাপে ভূঅর্ভন্তরে ব্যাপক পীড়ন ঘটে চলেছে এবং পীড়নের মাত্রা সহ্যসীমা অতিক্রমের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে) এ জনবসতি বৃদ্ধি অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যটন, হাইওয়ে, ড্যাম এবং নতুন স্থাপত্য নির্মাণ প্রকল্প বিপুলহারে বেড়ে চলেছে। অথচ ভূতাত্ত্বিকভাবে এটি খুবই ভঙ্গুর অঞ্চল। একটা বড় মাত্রার ভূমিকম্প এই সেগমেন্টে (ফল্ট জোন অঞ্চলে) যে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটাতে পারে তাতে ভয়াবহ ভূমিধ্বস ঘটবে, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি ধ্বংস হবে এবং দেরাদুন, হরিদ্বার, ঋষিকেশের মত শহরগুলিতে বিধ্বংসী প্লাবন ও বিপর্যয় ঘটাবে।

ছোট মাত্রার ভূমিকম্প যা ভূঅভ্যন্তরের স্ট্রেসকে মুক্ত করে, দীর্ঘ সময়কালে এখানে তেমন বড় মাত্রার ভূমিকম্প না ঘটায় বৈজ্ঞানিক ভাষার একটা সিসমিক গ্যাপ তৈরি হয়েছে, যা অঞ্চলে ভবিষ্যতে বিরাট মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা তৈরি করেছে। ■

সমাজ দর্পণ ঃ

পূজা কমিটিগুলোকে সরকারি অনুদানের রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভান

মানুষের ধর্মবিশ্বাস একান্ত ব্যক্তিগত। সেই বিশ্বাসে যেমন রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না, ঠিক তেমনি রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। এটাই একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চরিত্র হওয়া উচিৎ। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিপরীত। এইক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের অতীত ও বর্তমান প্রত্যেক সরকারের মধ্যে বিস্তর কোনও পার্থক্য নেই।

ধর্মীয় উৎসবে সরকারি ছুটি / প্রতিবছর নিয়ম করে সরকারি স্কুলে সরস্বতী পূজো, অফিসে বিশ্বকর্মা পূজো, থানায় থানায় কালীপূজো / ট্রাস্টি বোর্ডের নামে ঘুরপথে সরকারি পয়সায় কোথাও রাম মন্দির কোথাও বা জগন্নাথ মন্দির / মহাকুম্ভ বা হজযাত্রায় সরকারি সহযোগিতা / ইমাম ভাতা, মোয়াজ্জেম ভাতা, পুরোহিত ভাতা থেকে শুরু করে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণাকে বারংবার পদদলিত করা অব্যাহত। দুর্গাপূজোয় পূজো কমিটিদের সরকারি অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত এই একই পথের শরিক।

ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা আমাদের দাবি। কোনও ধর্মীয় খাতে সরকারি অনুদান প্রদান আইনত অবৈধ। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে দুর্গা পূজাকমিটিগুলোকে রাজ্য সরকারের অনুদান প্রদান এবং প্রতি বছর সেই টাকার বৃদ্ধি আসলে ঘুরপথে ধর্মের নামে রাজনীতির অন্যতম কৌশল।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যের পূজো উদ্যোক্তাদের ১০ হাজার টাকা করে অনুদান এবং বিদ্যুতের বিলে ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া শুরু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ক্রমান্বয়ে বেড়েছে এই অনুদানের পরিমাণ। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে অনুদানের পরিমাণ ২৫ হাজার টাকা এবং করোনার সময়ে এক লাফে ৫০ হাজার টাকা করা হয়। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে ৬০ হাজার এবং ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ৭০ হাজার টাকা। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে আরও ১৫ হাজার টাকা বাড়ানো হয়। এবার হল ১ লাখ ১০ হাজার এবং বিদ্যুৎ বিলে ৮০ শতাংশ ছাড়। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ যে বছর অনুদান দেওয়া শুরু হয়, সেবার অনুদান প্রাপ্ত ক্লাবের সংখ্যা ছিল ২৮,০০০। পরের বছর অর্থাৎ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সেই সংখ্যা এক লাফে বেড়ে হয় ৪০,০০০। ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের হিসেব অনুযায়ী, বর্তমানে ক্লাবের সংখ্যা ৪৩,০০০। হিসেব করলে দেখা যায়, অনুদানের ফলে বর্তমানে রাজ্যের আনুমানিক খরচ হচ্ছে ৪৭৩ কোটি টাকা। এর সঙ্গে বিদ্যুৎ বিলের খরচ ধরলে এই টাকার হিসেব কয়েক গুণ বাড়বে।

তবে সরকার এক্ষেত্রে পুরো খোলা মাঠ পায় নি। প্রথম দিন থেকেই বাধার সম্মুখীন হয়েছে। পূজা কমিটিগুলোকে সরকারি অনুদানের বিরোধিতা করে হাইকোর্টে মামলা করেন দীর্ঘদিন ধরে যুক্তিবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত শ্রী সৌরভ দত্ত মহাশয়। সর্বশেষ শুনানির পর হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এর স্পষ্ট নির্দেশ যে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে সকল পূজো কমিটি কোর্ট নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ে সরকারকে Utilisation Certificate দেয় নি, রাজ্য সরকার এবার তাঁদের টাকা দিতে পারবে না। অর্থাৎ প্রথমত বিষয়টা শুধু ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ব্যাপার নয়। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর এই বিষয়ে সব কটি মামলার সময়ে কোর্ট যে পূজা কমিটিগুলোকে হিসেব দিতে বলেছিল সেই অর্ডার মানা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখে এবার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ কোর্ট নির্ধারিত সময়ে এই হিসাব দেওয়া হয়েছিল কিনা এবছর টাকা দেওয়ার সময় সেটিকেও গণ্য করা হবে। যখন খুশি হিসেব দিলে কমিটিগুলোর দাবি মান্যতা পাবে না।

এছাড়া অনেকের প্রশ্ন, শিলিগুড়ির যে তিনটে ক্লাব এখনও গত বছরের হিসাব দেয়নি, সরকার কি ওই তিনটে ক্লাব বাদ দিয়ে বাকি সব ক্লাবকে টাকা দিতে পারবে? মামলাকারীর আইনজীবীদের মতে কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সেটা সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যদি এরকম কোনও সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নেয় তাহলে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের আদেশের অবমাননা হবে। মামলাকারীর আইনজীবীরা সেক্ষেত্রে আদালত অবমাননার মামলা করতে পারেন। এবং তাঁদের দাবি সেক্ষেত্রে তাঁদের হাতে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই সরকারি ছাপ সহ সম্পূর্ণ তথ্যপ্রমাণ আছে।

মোদ্দা কথা, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলার সাপেক্ষে ভালো করে পূজা করতে টাকা দেওয়ার অনুমতি আজ অবধি কলকাতা হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে দেয় নি। তাঁদের টাকা দেওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁদের দেওয়া হিসাব (Utilisation Certificate) তথ্যপ্রমাণ সহ অস্বচ্ছ বলে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ যদি সরকারি কোনও অডিট সংস্থা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটগুলো খুঁটিয়ে বিচার করে, জিএসটি বিল সহ সমস্ত তথ্য সত্যি বলে প্রমাণিত হয় তাহলেই এই অর্থ

পাওয়াটা বৈধ হবে। না হলে অবৈধ।

এখানেও প্রশ্ন আসে, যে হিসাব পূজা কমিটিগুলো রাজ্য সরকারকে দিচ্ছে তা কি স্বচ্ছ ও ন্যায্য? এই ব্যাপারেও মামলাকারীরা মাননীয় আদালতের কাছে সরকারি কোনও বিশ্বাসযোগ্য অডিট সংস্থাকে নিয়োগ করার আর্জি জানাবে বলে ঘোষণা করেছেন।

সরকারি টাকা ব্যবহার এবং হিসেবের স্বচ্ছতা নিয়ে তো সিদ্ধান্ত হল, কিন্তু যেটা মূল প্রশ্ন অর্থাৎ পূজো কমিটিগুলোকে সরকারি অনুদান দেওয়া যায় কিনা সেই ব্যাপারে আদালতে সওয়াল জবাব হয়েছে? হ্যাঁ, সেটাও হয়েছে। কারণ এটাই ছিল মামলাকারীদের প্রথম এবং প্রধান দাবি। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্টে এই ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করায় সরকার জানায় তারা দুর্গা পূজা করতে টাকা দিচ্ছে না। দুর্গা পূজার কমিটিগুলোর হাতে এই অনুদান তুলে দিচ্ছে যাতে তারা বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করতে পারে এবং সরকার নিজে যে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারছে না সেই সকল কাজ পূজা কমিটিগুলোকে দিয়ে সারা বছর ধরে করিয়ে নেওয়া যায়। এটাও একটা ভাঁওতা। নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পূজাকমিটিদের প্রতিনিধিদের সামনে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান আরও ভালোভাবে পূজা করার জন্য অনুদানের টাকা বাড়ানো হল বলে স্পষ্ট ঘোষণা করছেন আর আদালতে সরকার পক্ষের উকিলেরা রাজ্য সরকারকে বাঁচাতে ভিন্ন কথা বলছেন। সাধারণ মানুষকে বোকা বানাবার জন্য শাসকের এই কারসাজি অতীতকাল থেকে অব্যাহত।

আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য, পরিকাঠামো তৈরি ও উন্নয়নের কাজের জন্য পৌরসভা, মিউনিসিপ্যালিটি, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের অনেক দপ্তর আছে। সেইসকল দপ্তরকে বাদ দিয়ে পূজা কমিটিগুলোকে দিয়ে পরিকাঠামো তৈরি কাজের কথা বলা আসলে একটি নির্ভেজাল চালাকি। অধিকাংশ পূজা কমিটিরই পরিকাঠামো বা আর্থিক ক্ষমতা নেই। তাই যাতে তারা জাঁকজমক করে পূজা করতে পারে তার জন্য কৌশলে ঘুরপথে টাকা দিয়ে পূজাকমিটিগুলোকে তুষ্ট করা, ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করে নির্বাচনে এই শক্তিকে ব্যবহার করা এবং উৎসবকে কেন্দ্র করে পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিশাল বাজার তৈরি করার এটা একটা অবৈধ পথ। আমরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জনগণের করের টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

এই অনুদান প্রদান যে সকলে মুখ বুজে সহ্য করছে তা কিন্তু নয়। খুব অল্প হলেও কয়েকটি পূজা কমিটি এই অনুদান প্রত্যাখান করেছে। এছাড়াও কিছু কিছু জায়গায় অনুদান প্রাপ্ত কমিটিগুলোকে অনেকে চাঁদা দিতে চাইছেন না বা কমিটি নির্ধারিত চাঁদার অনেক কম টাকা দিচ্ছেন। চাঁদার জুলুমের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার মাঝে প্রত্যাখানের এই নতুন অভিজ্ঞতা আশা জাগায়।

বিধানসভার বর্তমান বিরোধী দল সব ব্যাপারে লম্ফঝম্প করলেও এই ব্যাপারে নীরব। হিন্দুত্বের এজেন্ডার বিরোধিতা যে তাঁদের পক্ষে কখনওই সম্ভব নয়। অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দলগুলো তো দূর, এমনকি তথাকথিত কমিউনিস্ট নামধারী দলগুলোও জনসমর্থন হারাবার ভয়ে সাংগঠনিকভাবে সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যায় নি বা তাঁদের পক্ষ থেকে কোনও জোরালো প্রতিবাদও হয় নি।

রাষ্ট্র দ্বারা ধর্মকে উৎসাহ দানের বিরুদ্ধে সকল প্রগতিশীল, বিজ্ঞানমনস্ক এবং যুক্তিবাদী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই। এইভাবে জনগণের করের টাকায় পোষা পাড়ায় পাড়ায় মস্তান বাহিনী, থ্রেট কালচারকে সর্বত্র বিকশিত করে চলেছে। সরকারের নিন্দার পাশাপাশি এই প্রসঙ্গে ন্যায়ালয়ের ভূমিকাকেও আমাদের বিচারের আওতায় আনা প্রয়োজন। ন্যায়ালয় শুধুমাত্র স্বচ্ছতার প্রশ্নটি নিয়েই কাটাছেঁড়া করেছে। ধর্মীয় খাতে সরকারি টাকা প্রদানের বিষয়ে কোনও যুগান্তকারী রায় তাঁদের পক্ষ থেকে আসে নি। আসল কথা হল, রাষ্ট্রের চারটি স্তম্ভের প্রত্যেক স্তম্ভই ধর্মকে প্রমোট করার এই কৌশলের সাথে জড়িত। আইনসভা নীতি প্রণয়ন করছে, বিচারসভা ঘুরিয়ে সমর্থন করছে, প্রশাসন সিদ্ধান্ত কার্যকরী করছে আর প্রচারমাধ্যম মানুষের মগজ ধোলাই করে টিআরপি বাড়াচ্ছে। রাষ্ট্র ও ধর্মের এই যোগসাজশে ক্ষতি হচ্ছে সাধারণ জনগণের। কারণ তাদের পকেটের অর্থাৎ করের টাকা মৌলিক চাহিদা পূরণের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে ভোট রাজনীতির স্বার্থে দেদার খরচ হচ্ছে। অথচ এই টাকা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলনিকাশি সহ জনজীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারতো। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের অন্য একটি মামলার বিচারকেরা ওনাদের পর্যবেক্ষণে "মাসকুলার ডিস্ট্রোফার" এর মতো বিরল রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে যন্ত্র কিনতে পারছে না অথচ পূজাকমিটিগুলোকে দেদার অনুদান দেওয়া হচ্ছে কেন, এই প্রশ্ন তুলে রাজ্য সরকারকে বিব্রত করেছিল। যার সদুত্তর সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভব হয় নি।

এইসকল ঘটনা বারংবার প্রমাণ করে ধর্মনিরপেক্ষতার বড়াই করা ভারত রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ নয়, বরং জনগণকে শোষণ শাসনের রূপ আড়াল করার জন্য ধর্মের প্রচার প্রসারের পক্ষপাতী।

শাসকের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার একটা ভান মাত্র। আমরা একদিন অবশ্যই জনগণের কাছে এই ভান অর্থাৎ ছদ্মবেশ উন্মুক্ত করব। সেই প্রচেষ্টাতেই আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত। ■

ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে নাগরিকত্বের পঞ্জিকরণ – যুক্তি ও মানবতা বিরোধী

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটার তালিকা সংশোধন একটা স্বাভাবিক বিষয়। পুরানো ভোটারের মৃত্যু এবং নতুন ভোটারের সংযুক্তিকরণ, ভোটারের বাসস্থান পরিবর্তন সব সময়ই ঘটে থাকে। এতে কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আপত্তি করেন না। এই কারণে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে নির্বাচন প্রক্রিয়ার রুটিন কাজ হিসেবে নির্বাচন কমিশন তা করে থাকে। তবুও সংবাদে প্রতিটি বুথেই মৃত ভোটার, ভুয়ো ভোটারের কথা যেমন শোনা যায় তেমনই তালিকায় নাম না থাকা মানুষও দেখা যায়। ফলে সংসদীয় নির্বাচনে কতটা জনমত যাচাই হয় তা নিয়ে অনেকের সংশয় আছে।

কিন্তু সম্প্রতি বিহার বিধানসভা নির্বাচনের কয়েকমাস আগে ভোটার তালিকায় 'স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন' (SIT) বা 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' এর নামে নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিলের বিষয়টি সামনে এসেছে। রাজনৈতিক দলগুলি নিজস্ব ভোটব্যাঙ্কের ক্ষয় বা বৃদ্ধির আশঙ্কায় এই নিয়ে তর্জায় মেতেছেন। সাধারণ মানুষের এই নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কারণ তারা বোঝেন এসবে তাদের কোন স্বার্থ নেই, মন্ত্রীসভার বদল ঘটলেই মানুষের অধিকার নিশ্চিত হয় না।

কিন্তু ভোটার তালিকা সংশোধনের যেভাবে নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিলের প্রশ্নটিকে জুড়ে কার্যত এনআরসি'র পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরু হবে বলে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রশ্নে উত্তেজনা প্রবল।

বলা হচ্ছে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে। এরজন্য কমিশন প্রথমে ১১টি নথি দাখিলের কথা বলে। কিন্তু এর মধ্যে নির্বাচন কমিশন দ্বারা প্রদত্ত ভোটার কার্ড বা এপিক কার্ড নেই। এর থেকেই প্রশ্ন উঠছে উক্ত ১১টি নথি দেখাতে না পারলে দেশের নাগরিকদের কি বেনাগরিক করবার ষড়যন্ত্র হচ্ছে? এখন প্রথমেই উক্ত ১১টি নথি কী কী তা জেনে নেওয়া দরকার। এগুলি হল –

১) কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী বা রাজ্য সরকারি কর্মচারী অথবা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর পরিচয়পত্র

২) ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুলাই এর আগের কোনও সরকারি (কেন্দ্র অথবা রাজ্য) নথি – ব্যাঙ্ক, পোঃ অফিস বা এলআইসি-র নথিও গ্রাহ্য

৩) জন্মের শংসাপত্র

৪) বৈধ পাসপোর্ট

৫) বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া শিক্ষা সংক্রান্ত শংসাপত্র

৬) সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থায়ী বসবাসকারীর শংসাপত্র

৭) তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত হলে তার শংসাপত্র

৮) এনআরসি তালিকায় নাম

৯) বনাঞ্চলের অধিকার শংসাপত্র

১০) রাজ্য সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের তৈরি করা 'রেজিস্টার'

১১) সরকার প্রদত্ত জমি বা বাড়ির নথি (দলিল, পর্চা ইতাদি)।

যে কোন যুক্তিবোধে আস্থাশীল মানুষই মেনে নেবেন যে উক্ত ১১টি নথির একটিও শুধুমাত্র 'দিন আনা দিন খাওয়া' শ্রমজীবী মানুষ নন, বহু মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের কাছেও নেই। খোদ ভারত সরকারই তার নোটিফিকেশন-এ জানিয়েছিল, ২০০৩-এর ১লা অক্টোবর থেকে জন্ম নেওয়া সকলের জন্ম শংসাপত্র ছাড়া পাসপোর্ট বা অন্য কোন সুবিধা মিলবে না। আজও দেশের বহু শিশুর জন্ম তার ঘরে, এমনকি ফুটপাতে চিকিৎসকের সহযোগিতা ছাড়া হয়। তাহলে জন্ম শংসাপত্র দেশের কতজন নাগরিকের আছে?

দেশের কত শতাংশ মানুষ সরকারি চাকুরি করেন বা অবসর প্রাপ্ত? দেশের কতজন মানুষের নিজস্ব জমি-বাড়ি আছে? কতজন মানুষের পাসপোর্ট আছে? কতজন মানুষ বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি অতিক্রম করেছেন? কতজন তফশিলি জাতি, জনজাতি বা অনগ্রসর মানুষ সরকারি শংসাপত্র পেয়েছেন? বনাঞ্চল থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের মধ্যে কতজনকে বনাঞ্চল অধিকার শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে? কতজনের নাম সরকার বা প্রশাসনের রেজিস্টার-এ আছে? সাম্প্রতিকালে নানা সরকারি ভাতা চালুর আগে দেশের কতজনের ব্যাঙ্ক, পোঃ অফিস-এ অ্যাকাউন্ট ছিল?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর সরকার বা প্রশাসনের অজানা নয়। ভারতের সংবিধানের ৩২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিকরাই সংসদীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। ২০০৩-এর পরবর্তীতে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া ভোটাররা তো দীর্ঘ ১২ বছর ধরে লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত, পৌরসভায় ভোট দিয়ে আসছেন। এখন বলা হচ্ছে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে। তবে কি এতকাল অবৈধ ভোটে সাংসদ, বিধায়ক, কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন?

➔

প্রশ্ন ও উত্তর ঃ

ভয় পেলে আমাদের লোম খাড়া হয়ে যায় কেন?

আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, হঠাৎ কোনো ভয়ঙ্কর শব্দ শুনলে, কিংবা ভৌতিক গল্প পড়তে পড়তে শরীরে কেমন একটা শিহরণ খেলে যায় – আর সঙ্গে সঙ্গে হাত-পায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। আমরা বলি "গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল"।

কিন্তু কেন এমন হয়?

আমাদের শরীরে আছে অদৃশ্য অ্যালার্ম সিস্টেম। মস্তিষ্কে আছে এক বিশেষ সংবেদন কেন্দ্র অ্যামিগডালা, যা ভয়কে চেনে আর দ্রুত সাড়া দেয়। আপনি ভয় পেলেই, অ্যামিগডালা হাইপোথ্যালামাসকে সংকেত পাঠায়। হাইপোথ্যালামাস আবার শরীরের সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকে চালু করে দেয়। এইসময় সক্রিয় হয়ে ওঠে অ্যাড্রেনালিন, সেই বিপদকালীন হরমোন যে আপনাকে মুহূর্তে লড়াই বা পালানোর জন্য প্রস্তুত করে। এবার সে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে ত্বকে।

ত্বকের লোমকূপের গোড়ায় থাকে অতি ক্ষুদ্র পেশি – আরেকটর পিলাই (arrector pili muscle)। ভয় অথবা ঠান্ডার সময় অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে এই ক্ষুদ্র পেশি হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়। ফলাফল? লোম যে ত্বকের উপর শুয়ে থাকবে সে উপায় নেই! সে বাধ্য ছেলের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়! ত্বকের ওপর ছোট ছোট ফোস্কার মতো দেখা দেয়, যাকে বলে গুজবাম্পস (goosebumps)।

আজ আমাদের শরীরে লোম কম, তাই কাজের তেমন গুরত্ব নেই। কিন্তু আমাদের পশমওয়ালা পূর্বপুরুষদের জন্য এটা ছিল দারুন দরকারি। লোম খাড়া হয়ে শরীরকে বড় ও ফোলা দেখাত। ফলে প্রতিপক্ষ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেত। খাড়া লোমের ফাঁকে বাতাস আটকে গরম স্তর তৈরি হতো, যা শরীরকে শীতে উষ্ণ রাখত। এখনো দেখবেন বিড়াল বা কুকুর ভয় পেলে শরীর ফুলিয়ে তোলে – এটাই সেই একই কৌশল।

এখন আধুনিক মানবের শরীরে বড় কোনো পশম নেই, তাই আমরা শুধু অনুভব করি শিহরণ আর কাঁটা দেওয়া। এ যেন বিবর্তনের এক অবশিষ্ট চিহ্ন – আমাদের শরীর এখনো সেই পুরোনো স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে। তাই ভয় পেলে লোম খাড়া হয়ে যাওয়া কোনো অদ্ভুত ঘটনা নয় – এটা হলো আমাদের শরীরের পুরোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যেটা একসময় বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য ছিল, আর এখন শুধুই একটা শারীরবৃত্তীয় স্মৃতি। ■

●*ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে নাগরিকত্বের পঞ্জিকরণ – যুক্তি ও মানবতা বিরোধী*

তবে তো এনারা সকলেই অবৈধ! সুতরাং এসআইআর কে ভারত সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা এবং জনতার উপর জুলুমবাজি ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না।

এসআইআর-এর জন্য প্রয়োজনী নথি কেন ভোটার বা আধার কার্ড হবে না এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র কাজিয়া শুরু হয়েছে। একদিকে আদালতে মামলা এবং অন্যদিকে আন্দোলন শুরু হয়। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট ১২ নং নথি হিসেবে আধার কার্ডকে মেনে নিয়েছে। যদিও সরকারিভাবে নাগরিকদের দেওয়া আধার কার্ডগুলির সব বৈধ নয় বলা হচ্ছে এবং এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষতঃ একটি বিশেষ ধর্মীয় পরিচয় বহণকারী মানুষদের মধ্যে। ভাষা এবং ধর্ম পরিচয়কে সামনে রেখে প্রবাসী শ্রমিকদের বাংলাদেশী, রোহিঙ্গা ইত্যাদি লেবেল দিয়ে নিপীড়ন করা হচ্ছে।

ঘটনাদৃষ্টে বলা যায় এই এসআইআর এর নামে নাগরিকত্বের পঞ্জিকরণের ষড়যন্ত্র ব্যাপক সংখ্যক জনতাকে বেনাগরিক ঘোষণা করে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকারহীন মানুষে পরিণত করে এক তীব্র শোষণ ও দমননীতি লাগুর ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

বিজ্ঞান মনস্ক পশ্চিমবঙ্গ জোরগলায় ঘোষণা করে পৃথিবীর কোন মানুষই সেই অঞ্চলের ভূমিপুত্র বা ভূমিকন্যা নয়, সকল মানবজাতিই অভিবাসী। শারীরবৃত্তীয়ভাবে আফ্রিকাতে আজ থেকে ২ লক্ষ বছর আগে আধুনিক মানুষের উৎপত্তি হয়ে অভিগমন প্রক্রিয়ায় সারা বিশ্বে তারা ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর সব মানুষই তাই অভিবাসী। একসময় প্রকৃতির রোষ থেকে বাঁচতে এবং খাদ্য অন্বেষণে মানুষ অভিবাসী হয়েছিল। আর আজ যুদ্ধ, দেশভাগ, বিস্থাপন, কাজের খোঁজে, দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষ একদেশ থেকে অন্য দেশে যান।

সুতরাং বর্তমান ভারতে বসবাসকারী সকলকেই ভারতের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। উৎপীড়ন এবং ধর্ম-জাতি-ভাষাগত বিভাজন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নাগরিক পঞ্জিকরণ করা চলবে না। ■

প্রশ্ন ও উত্তর ঃ

শিলাবৃষ্টি কেন হয়?

বজ্রপাতের মতোই প্রকৃতির আর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি হলো শিলাবৃষ্টি বা হেলস্টোন (hailstone) পড়া। হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে যায়, তারপর আকাশ থেকে শুধু বৃষ্টি নয়, বরফের ঢেলা ঝরে পড়ে। কখনও সেগুলো ছোট টুকরো, আবার কখনও যেন টেনিস বলের আকারের! কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই শিলাবৃষ্টি হয় কীভাবে? কেনই বা আকাশ থেকে পড়ে বরফের বল?

শিলাবৃষ্টির গঠন শুরু হয় বিশেষ ধরনের মেঘের মধ্যে, যাকে বলে কিওমিউলোনিম্বাস (Cumulonimbus) মেঘ। এই মেঘ সাধারণত বজ্রঝড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প, শক্তিশালী উল্লম্ব বায়ুপ্রবাহ (up-draft) ও তীব্র ঠান্ডা তাপমাত্রা। যখন এই মেঘের মধ্যে জলকণা অনেক উঁচুতে উঠে যায়, তখন তার তাপমাত্রা মাইনাস ১০ থেকে মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পৌঁছে বরফে পরিণত হয়। এই বরফ কণা বা অতি ঠান্ডা জলকণা একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পুনঃশিলীভবনের ফলে জমাট বাঁধতে থাকে। উপরের দিকে ওঠা ও নিচের দিকে পড়ার এই চলাচল চলতে থাকে বারবার – এতে বরফের বলের উপর একের পর এক স্তর জমতে থাকে, ঠিক যেন পেঁয়াজের খোসা। তবে নতুন গবেষণা বলছে .... সব শিলাবৃষ্টির গঠন একইভাবে হয় না!

২০২৫ সালে চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের NCAR-এর গবেষকরা মিলিতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। Xiangyu Lin এবং Qinghong Zhang-এর নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণায় চীনের ৯টি ঝড় থেকে সংগৃহীত ২৭টি হেলস্টোনের নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়। এতে দেখা যায়, পূর্ববর্তী ধারণার মতো অধিকাংশ হেলস্টোন বারবার উপরে-নিচে ওঠা-নামার মাধ্যমে তৈরি হয় না। মাত্র ১টি হেলস্টোন-এ এমন প্রমাণ মিলেছে। ১০টি হেলস্টোন একবারেই নিচে নামার সময় গঠিত হয়েছে। ১৩টি হেলস্টোন একবার উপরে উঠে গঠিত হয়েছে। আর ৩টি হেলস্টোন অনুভূমিকভাবে চলাচল করেছে। এছাড়াও দেখা গেছে, এই হেলস্টোনগুলি সাধারণত মাইনাস ৮.৭° সেলসিয়াস থেকে মাইনাস ৩৩.৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে তৈরি হয়।[১]

এখন প্রশ্ন কেন এমন শিলাবৃষ্টি ঘটে?

শিলাবৃষ্টি হওয়ার জন্য কিছু বিশেষ পরিবেশগত শর্ত দরকার ঃ ১) তীব্র উল্লম্ব বায়ুপ্রবাহ (strong updraft) যা হেলস্টোনকে

বাতাসে ভাসিয়ে রাখতে ও বড় হতে সাহায্য করে। ২) সুপারকুলড্ জলকণা যা হেলস্টোনের গায়ে বরফের স্তর তৈরি করে। ৩) বজ্রগর্ভ মেঘ (cumulonimbus) যা প্রচুর জলীয়বাষ্প এবং বায়ুপ্রবাহের উৎস। যখন হেলস্টোনের ভর এত বেড়ে যায় যে বায়ুপ্রবাহ তাকে আর ধরে রাখতে পারে না, তখনই সে মাটিতে পতিত হয় – এই ঘটনাকেই আমরা বলি শিলাবৃষ্টি।[২]

শিলাবৃষ্টি ফসলের ক্ষতি, যানবাহনের ক্ষতি, বাড়িঘর ভাঙা এমনকি মানুষ বা পশুপাখির মৃত্যুও ঘটাতে পারে। তাই আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে হেলস্টোন গঠনের তথ্য জানা গুরুত্বপূর্ণ – এতে শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস আরও নির্ভুলভাবে দেওয়া যাবে এবং বিপদের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা যাবে। শিলাবৃষ্টি প্রাকৃতিক এক বিস্ময়। বিজ্ঞান যত এগোচ্ছে, তত আমরা জানতে পারছি এই বরফের বলগুলোর গঠনের রহস্য। নতুন গবেষণাগুলি আমাদের আগাম সতর্কতা দিতে এবং প্রকৃতিকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। হয়তো ভবিষ্যতে আমরা এমন প্রযুক্তি তৈরি করতে পারব, যা শিলাবৃষ্টির ক্ষয়ক্ষতি অনেক কমিয়ে দেবে। ■

তথ্যসূত্র ঃ

১। Lin. X., Zhang. Q., et al. (2025). *Advances in Atmospheric Scinces.* "Isotopic Analysis for Tracing Vertical Growth Trajectories of Hailstones" *DOI : 10.1007/s00376-024-4211-x*

২। Popular Mechanice : *"Hailstones Aren't Formed the Way You Think They Are"* 2025

প্রশ্ন ও উত্তর ঃ

মাউন্ট এভারেস্ট কি চিরকাল পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হয়ে থাকবে?

মাউন্ট এভারেস্ট হ'ল পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, যা সমুদ্রতল থেকে ৮৮৪৮ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন বলে প্রমাণিত। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয়ে ৮ হাজার মিটারের উর্ধ্বে অনেক পর্বতশৃঙ্গ আছে, যা বিশ্বের বিস্ময়! কেউ বলেন হিমালয়ের উচ্চতা বাড়ছে আবার কেউ বলেন কমছে। মাউন্ট এভারেস্ট নিয়েও বহু ধারণা প্রচলিত আছে। মাউন্ট এভারেস্ট কি চিরকাল পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হয়ে থাকবে?

এর উত্তর পেতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে কিভাবে পর্বতমালা সৃষ্টি হয় এবং মাউন্ট এভারেস্ট সহ হিমালয় পর্বতমালার শৃঙ্গগুলি কী কারণে এত উঁচু হল?

হিমালয় যেহেতু দুটি টেকটনিক প্লেটের সংঘর্ষজাত পর্বতমালা যেখানে পরস্পর অভিমুখী দুটি প্লেটের একটি প্লেট (তুলনায় হাল্কা) উপরে এবং অপর প্লেট (তুলনায় ভারি) নিচে পিছলে নেমে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই সময়কালে সংলগ্ন অঞ্চলের ভূত্বক সংঘর্ষের কারণে দুমরে, মুচরে, কচলে যেমন উঁচু পর্বত সৃষ্টি করেছে তেমনই ঘটেছে নানা ফাটল, চ্যুতি এবং ভাঁজ খাওয়ার ঘটনা।

স্কটল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ রব বাটলার এর মতে দুই প্লেটের সংঘর্ষে সৃষ্ট পর্বতমালার উচ্চতা নির্ভর করে ভূত্বকের বেধ (thickness) এর উপর। তিনি লাইভ সায়েন্স পত্রিকাকে বলেন এই বেধের পরিমাপ নির্ভর করে টেকনটিক সংঘর্ষের প্রাবল্য, দৈর্ঘ্য এবং ভূত্বকের তাপমাত্রার উপর। লাইভ সায়েন্স পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রফেসর বাটলার বলেন "এই ভূত্বককে কঠিন পদার্থ হিসেবে বিচার করলে ঠিক হবে না, তা হল ম্যাপেল সিরাপ বা ঘন ফলের রস এর মতো চটচটে, খুব সান্দ্র (Viscous) পদার্থ। ঠান্ডা ম্যাপেল সিরাপের মত ঠান্ডা ভূত্বক অধিকতর সান্দ্র এবং তাই অধিক দৃঢ় এবং এই কারণে অধিকতর বৃহৎ বেধসম্পন্ন। ঠান্ডা ভূত্বক সরু এবং উষ্ণ ভূত্বকের উপর অধিষ্ঠিত পর্বতের তুলনায় উঁচু হয়।

ভূত্বকের বেধ (thickness) এবং উষ্ণতা ছাড়াও পর্বতের উচ্চতা ও তার বৃদ্ধি নির্ভর করে পর্বতের ক্ষয়ের পরিমাণের উপর। বিজ্ঞানী বাটলারের মন্তব্য হ'ল – এই ক্ষয়কার্যের জন্যই হিমালয় অঞ্চল এই পৃথিবীর সবথেকে দ্রুতহারে উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়া প্রস্তররাশি। এর ব্যাখ্যা করা যায় ভূত্বকের সমান স্থবিরতা নীতি (Principle of Isostasy) দ্বারা। যেমন একটি মালবাহী জাহাজে যত কম মাল থাকে বা তা থেকে যত মাল খালাস করা হয় সমুদ্র বা নদীর জলে তা অধিক উচ্চতায় থাকে, জাহাজে মালের পরিমাণ বাড়ালে জাহাজ নিচু হয়। এই নিয়ম অনুসারে কোন পর্বত যত বেশি নদী, হিমবাহ, ভয়াবহ বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধ্বসের শিকার হয় সেই পর্বত পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে তত দ্রুতহারে উপরে উঠতে থাকে (অর্থাৎ উচ্চতা বৃদ্ধি পায়)।

২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী রব বাটলার এবং বিজ্ঞানী ম্যাথু ফক্স (ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডনের অধ্যাপক) দ্বারা এভারেস্ট সংলগ্ন ৭২ কি.মি অঞ্চলের একটি সমীক্ষা থেকে প্রস্তুত গবেষণাতে জানা গেছে যে ব্যাপক ক্ষয়কার্যের ফলে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা বিগত ৮৯ হাজার বছরে বেড়েছে ৪৯ থেকে ১৬৪ ফুট (১৫ থেকে ৫০ মিটার)। যদিও ক্ষয়কার্যের সঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। উক্ত গবেষণার অন্যতম কান্ডারি অধ্যাপক ম্যাথু ফক্স বলেন "কোন পর্বত ক্রমশ উঁচু হবো না নিচু হবে তা নির্ভর করে ক্ষয়কার্যের হার এবং টেকটনিক কারণে উচ্চতা বৃদ্ধির হারের ভারসাম্যের উপর। অধ্যাপক ফক্সের মতে যদি কোন পর্বতে টেকটনিক কারণে উচ্চতা বৃদ্ধির হার ক্ষয়কার্যের হারের তুলনায় বেশি হয় তবে সেই পর্বত ক্রমশ উঁচু হতে থাকে। বিপরীত ঘটনা ঘটলে সেই পর্বত ক্রমশ নিচু হতে থাকে।

প্রসঙ্গত বলা যায় ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি, বিন্ধ্যপর্বত বা আরাবল্লী পর্বতমালার উচ্চতা কয়েক কোটি বছর ধরে কমে চলেছে। এই কারণে এদের ক্ষয়জাত পর্বতও বলা হয়। এর কারণ মধ্যভারতে (ভূতত্ত্বের ভাষায় প্রায় টেকটনিক্যালি স্থবির Shield অঞ্চল) পর্বতের ক্ষয়ই শুধু ঘটেছে ঊর্ধ্বমুখী টেকটনিক বল প্রায় অকার্যকর থেকেছে।

যাই হোক অধ্যাপক বাটলার এবং ফক্সের গবেষণার ভিত্তিতে কিছু ভূবিজ্ঞানী মনে করেন যে বর্তমান পৃথিবীর নবম উচ্চতম শৃঙ্গ নাঙ্গা পর্বত (৮১২৬ মিটার) এর উচ্চতা বৃদ্ধির যে বর্তমান হার তাতে তা ভবিষ্যতে এভারেস্টের উচ্চতা (৮৮৪৮ মিটার) ছাপিয়ে যাবে। কিন্তু বিজ্ঞানী বাটলার এবং বিজ্ঞানী ফক্স এখনই এই নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি নন। যদিও তারা এই তথ্য মেনে নিয়েছেন যে নাঙ্গা পর্বত অঞ্চলে অতিভারি বৃষ্টিপাতের জন্য ক্ষয়কার্যের হার বেশি হওয়ায় তার উচ্চতাবৃদ্ধির হার এভারেস্টের তুলনায় বেশি। এভারেস্ট তুলনায় কম ক্ষয়কার্যের ফলে তুলনায় ধীর গতিতে উচ্চতাবৃদ্ধি করছে এবং এখনও ৬২২ মিটার অধিক উচ্চতাসম্পন্ন।

ভূবিজ্ঞানীদের মতে সমগ্র হিমালয় পর্বতমালা অঞ্চলে দুই প্লেটের সংঘর্ষ এবং টেকটনিকভাবে অস্থিরতা চলবে আরও প্রায় ১ কোটি বছর। এই সময়কালে বহু প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত টানা এখনই অর্থহীন হবে। ■

[তথ্যসূত্র ঃ উইল মাউন্ট এভারেস্ট অলওয়েস বি দ্য ওয়ার্ল্ড টলেস্ট মাউনটেইন – ক্যাথরিন ইরভিং, লাইভ সায়েন্স জার্নাল, অক্টোবর ২৭, ২০২৪]

বিজ্ঞানের খবর

মে

৮.●মধ্যযুগের অ্যালকেমিস্টদের কথা বা পরশ পাথরের কল্পকথা তো আমাদের জানা আছে। ধাতু নির্মিত সামগ্রীকে চোখের নিমেষে সোনায় পরিণত করার গল্প! অ্যালকেমিস্টদের অভিজ্ঞতাবাদী কার্যকলাপ বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা অ্যালকেমিস্টদের প্রয়াসকে করেছেন চরম বাস্তব। সম্প্রতি সার্নের লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের গবেষকরা সীসা থেকে সোনা বানাতে সক্ষম হয়েছেন। সীসা পরমাণুর (পারমাণবিক সংখ্যা = ৮২) কেন্দ্র থেকে তিনটি প্রোটন সরিয়ে নিলেই তো সোনার পরমাণুতে (পারমাণবিক সংখ্যা = ৭৯) রূপান্তরিত হয়। শুনতে বিষয়টি খুব সহজ মনে হলেও এটা ঘটানো অত সহজ ছিল না। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা যে প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছেন, তা কাজে লাগিয়ে সীসা থেকে ৮৫০০ কোটি সোনার পরমাণু তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই সংখ্যাটি খুব বেশি মনে হলেও এর ওজন মাত্র ২৯ পিকোগ্রাম ($১০^{-১২}$ পিকোগ্রাম = ১ গ্রাম)। [সার্ন]

●সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এক গবেষণায় স্বল্পনিদ্রার সাথে হৃদরোগের সম্পর্ক নিরূপণ করেছেন। মাত্র তিনদিনের স্বল্পনিদ্রার (প্রতিদিন ৪ ঘন্টা) ফলে হৃদরোগের জন্য দায়ী উপাদান রক্তে হাজির হয় বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে কাজের সময় বদলের (শিফটিং) ফলে নিদ্রাচক্রের উপর প্রভাব পড়লে নিদ্রাহীনতা বা স্বল্পনিদ্রা ঘটতে পারে। গবেষণা পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে সুইডেনের মানুষের এটা একটা জ্বলন্ত সমস্যা। [উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়]

৯.●সোভিয়েত শুক্রযান কসমস ৪৮২, টানা ৫৩ বছর মহাকাশে কাটানোর পর তা ভেঙ্গে পড়েছে। রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে জানানো হয়েছে যে যানটি পৃথিবীর নিম্ন কক্ষ থেকে পরবর্তী উচ্চকক্ষে উত্তরণ করতে ব্যর্থ হবার ফলেই এই দুর্ঘটনা। [এসটিসিএল]

১৩.●ওসিডি হল একধরণের মানসিক ও আচরণগত ব্যাধি। সারা পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ১.২% মানুষ এই ব্যাধির শিকার এবং এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বর্তমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থার দৌলতে এই রোগের প্রকোপ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই রোগের সঠিক কারণ বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার না হলেও বহুলাংশে জিনগত তা জানা ছিল। সম্প্রতি আমস্টারডামের একদল বিজ্ঞানী ৫০ হাজার ব্যাধিগ্রস্ত ও ২ লক্ষ স্বাভাবিক মানুষের উপর দীর্ঘ ও সুবিশাল গবেষণা সংঘটিত করে প্রায় ২৫০টি জিনের সন্ধান পেয়েছে যেগুলি এই ব্যাধির জন্য দায়ী। এই গবেষণা ও তার ফলাফল যুগান্তকারী যা আগামীদিনে ব্যাধিগ্রস্তদের সুস্থ জীবন দান করবে বলে বিজ্ঞানীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। [Scimex]

১৬.●জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে MoM-z14 নামক একটি ছায়াপথ আবিষ্কৃত হয়েছে যা এযাবত সবচেয়ে দূরবর্তী। বিজ্ঞানীদের ধারণায় ঐ ছায়াপথের জন্ম বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের সময় থেকে আনুমানিক ২৮০ মিলিয়ন বছর পরে। (অ্যাস্ট্রোফিজিক্স)

২০.●আপনি কি জানেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এক সেকেন্ডের ভিডিও বানাতে যে পরিমাণ শক্তি খরচ হয় তা বাড়ির মাইক্রোওয়েভ চুল্লীতে এক ঘন্টা রান্না করতে প্রয়োজনীয় শক্তির সমান? সাধারণত কম্পিউটার বা মোবাইলকে দেওয়া কোনও নির্দেশ ডেটা সেন্টারের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে তা আবার মোবাইলে ফিরে আসে। প্রত্যেকটি ধাপে বিভিন্ন নির্দেশের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ শক্তি খরচ হয় তার বিস্তারিত হিসেব নিকেশ করে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট করেছেন সম্প্রতি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা। [এমআইটি]

২১.●আমেরিকার ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনের বিজ্ঞানীরা এক গবেষণায় জানতে পেরেছেন যে ভিটামিন ডি-এর সম্পূরক বা সাপ্লিমেন্টস মানুষের জৈবিক বার্ধক্যের হার কমিয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুই অগ্রভাবে অবস্থিত টেলোমেয়ারের ক্ষয় হল বার্ধক্যের অন্যতম প্রধান কারণ। ভিটামিন ডি সম্পূরক এই ক্ষয়কে প্রতিরোধ গড়ে তোলে ফলে মানুষের আয়ুষ্কাল প্রায় তিন বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে। [আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন]

২২.●অস্ট্রেলিয়ার মুডক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি দল জানাচ্ছেন কৃষি জমিতে মাইক্রোপ্লাস্টিক ও ন্যানো প্লাস্টিকের পরিমাণ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁরা

দেখিয়েছেন যে কৃষি জমিতে মাইক্রোপ্লাস্টিকের পরিমাণ সমুদ্রের জলের তুলনায় প্রায় ২৩ গুণ বেশি। প্লাস্টিক ছাড়াও প্রায় ১০ হাজার রাসায়নিক পদার্থের অনিয়ন্ত্রিক ব্যবহারের কথাও ওই গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মাটি থেকে ঐ প্লাস্টিক ফসলে ও তার থেকে মানুষের শরীরে নিঃশব্দে প্রবেশ করছে যা গণস্বাস্থ্যকে আগামীদিনে চরম ক্ষতিগ্রস্ত করবে। [Scimex]

●একদল চিনা বিজ্ঞানী একধরনের কন্ট্যাক্ট লেন্স আবিষ্কার করেছেন যা চোখে পড়ে নিলে অন্ধকারেও দেখা যাবে। এই লেন্স গ্যাডোলিনিয়াম, ইটারবিয়াম, আরবিয়াম ও সোনা দিয়ে বিশেষভাবে বানানো যা ৮০০ থেকে ১৬০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট অবলোহিত রশ্মি শোষণ করে ও ৩৮০-৭৫০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দৃশ্যমান রশ্মি বিকিরণ করতে সক্ষম। যার ফলে অন্ধকারেও বস্তু দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, ঐ লেন্স পরিহিত অবস্থায় চোখ বন্ধ থাকলেও বস্তু দৃশ্যমান হবে। [লাইফ সায়েন্স]

২৭.●আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলাজির বিজ্ঞানীরা নতুন এক ধরনের জ্বালানী কোষের উদ্ভাবন করেছেন যা বর্তমানে ব্যবহৃত লিথিয়াম কোষের তুলনায় তিন গুণ শক্তি উৎপন্ন করতে সক্ষম। সোডিয়াম ধাতু বাতাসের সাথে বিক্রিয়ায় যে বিপুল পরিমাণ তাপশক্তি উৎপন্ন করে তাকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে বিজ্ঞানীরা। লিথিয়ামের তুলনায় সোডিয়াম খুবই সহজলভ্য ও উপজাত দ্রব্যগুলি ব্যাপক শিল্পীয় ব্যবহার আছে। তাই আগামীদিনে মোটর গাড়ির পাশাপাশি বিমান ও জাহাজেও এই ব্যাটারির ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে চলেছে। (এমআইটি)

২৯.●অস্ট্রেলিয়ার পিটার ডোহার্টি গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা mRNA প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে দেহকোষ থেকে এইচ আই ভি ভাইরাস সাফাই করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে ৪০ মিলিয়ন মানুষ এই দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। এই আবিষ্কার ঐ রোগীদের ব্যাধিমুক্ত জীবন দান করবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করেছেন। (দ্য গার্ডিয়ান)

জুন

১১.●ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা প্রেরিত সোলার অরবাইটার সূর্যের দক্ষিণ মেরুর ছবি এই প্রথমবার পৃথিবীতে পাঠাতে সক্ষম হল। এটা জানা ছিল যে সূর্যের চৌম্বক মেরু প্রতি ১১ বছর অন্তর পরিবর্তিত হয়ে থাকে যা পৃথিবী সহ সৌরমন্ডলের সকল গ্রহ-উপগ্রহের উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু সেটা কিভাবে হয় তার বিজ্ঞানসম্মত সঠিক কারণ জানা ছিল না। মহাকাশ যানের পাঠানো ওই ছবি ও ভিডিও থেকে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা সূর্যের পৃষ্ঠে গ্যাসীয় তরলের প্রবাহসহ আরও অনেক ঘটনা লক্ষ্য করেন যা আগামীদিনে ওই প্রশ্নের উত্তর পেতে সাহায্য করবে। [বিবিসি নিউজ]

১৭.●চিনের বিজ্ঞানীরা নতুন এক ধরনের অপটিক্যাল কম্পিউটিং চিপ তৈরী করেছেন যা ১০০টি তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট সমান্তরাল সিগন্যালকে একসাথে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। এর ফলে কম্পিউটেশনের গতি যেমন বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে, শক্তির ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। এই উদ্ভাবন অপটিক্যাল কম্পিউটিং-এর জগতে এই উল্লেখযোগ্য উল্লম্ফন ঘটালো বলে বিজ্ঞানী মহল মনে করছেন। [ইউরেকঅ্যালার্ট]

২২.●ইংল্যান্ডের গ্রিনিচ-এর ঐতিহ্য মন্ডিত মানমন্দির 'রয়্যাল গ্রিনিচ অবজারভেটরি'র ৩৫০ বছর অতিক্রম করল। রাজা দ্বিতীয় চার্লস, ১৬৭৫ খিস্টাব্দে এই মানমন্দির নির্মাণ করেন যা সেই সময় 'ওল্ড রয়্যাল অবজারভেটরি' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই মানমন্দির সংলগ্ন স্থান থেকেই 0^0 দ্রাঘিমাংশ ধরা হয়। [বিবিসি নিউজ]

●দক্ষিণ আমেরিকার চিলি-তে নব নির্মিত 'ভেরা সি রুবিন অবজারভেটরি' তার কাজ শুরু করার সাথে সাথে রেকর্ড গড়ে ফেলল প্রায় ৪ হাজার আবিষ্কার করে। এর মধ্যে রয়েছে ভার্গো নক্ষত্রগুচ্ছ, ট্রিফিড ও লেগুন নেবুলা সহ ২ হাজার গ্রহাণু। এই অবজারভেটরি'তে ব্যবহৃত টেলিস্কোপটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত মানমন্দিরে বছরে প্রায় ২০ হাজার গ্রহাণু সনাক্ত করা হয় কিন্তু রুবিন সাত দিনেই প্রায় ২১০০ গ্রহাণু আবিষ্কার করতে সক্ষম যার মধ্যে অধিকাংশই নতুন। [ভেরা সি রুবিন অবজারভেটরি]

২৫.●মানুষের কোষের ভিতর সাইটোপ্লাজমে ভাসমান বেশ কিছু কোষ অঙ্গাণু রয়েছে যারা কোষের কার্যকলাপ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে থাকে। নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোজোম, গলগি বস্তু ইত্যাদি এদের মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি ভার্জিনিয়া স্কুল অব মেডিসিন ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ-এর বিজ্ঞানীরা মিলিতভাবে একটি নতুন অঙ্গাণু আবিষ্কার করেছেন যার নামকরণ করা হয়েছে

হেমিফিউসোম। এর গড় ব্যাস ২৯৯ ন্যানোমিটার যা মাইটোকন্ড্রিয়ার তুলনায় কয়েক হাজার গুণ ছোট। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন এই অঙ্গাণু কোষের গৃহস্থালি সামলানোর কাজ করে ও কোন বিপদ এলে তা জানান দেয়। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন আগামীদিনে কোষকে আরও বিশদে জানার ক্ষেত্রে এই কোষ অঙ্গাণু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। [ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়]

জুলাই

১.●মিথেনস্যাট নামক একটি মহাকাশযান মহাকাশে হারিয়ে গেছে। স্পেস এক্স নির্মিত যানটি এক বছর আগে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার কারণ ও ঐ গ্যাসের উৎসগুলি অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে যানটিকে মহাকাশে ৫ বছরের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তার মেয়াদ শেষ হল কিভাবে তা বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করছেন। তাদের অনুমান জ্বালানী শেষ হয়ে যাওয়ার কারণেই যানটি সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। [বিবিসি নিউজ]

৮.●বহুদিন পূর্বে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জীবজন্তুদের আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে কত না কল্পবিজ্ঞান লেখা হয়েছে। কিন্তু কলোজাল বায়েসায়েন্স নামক একটি সংস্থা জিন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তা বাস্তবায়িত করতে চলেছে। এই সংস্থা ইতিপূর্বে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া লোমশ ম্যামথ, তাসমানিয়ান বাঘ, সাদা গন্ডার, ডোডো পাখি ইত্যাদি জীবদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে চলেছে। একদা নিউজিল্যান্ড নিবাসী বিশালাকার পাখি মোয়া'কে সম্প্রতি এই দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে এই সংস্থা। এই সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে ২০২৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ লোমশ ম্যামথের জন্ম দিয়ে তার পূর্বপুরুষের বাসভূমি সুমেরুর তুন্দ্রা অঞ্চলে ফিরিয়ে দেবার উদ্যোগ চলছে জোর কদমে। [কলোজাল বায়োসায়েন্স]

●ইংল্যান্ডের 'সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার' সংস্থা একটি সমীক্ষায় জানাচ্ছে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে চিনের কার্বন বিকিরণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। একদিকে বিপুল শিল্পীয় বৃদ্ধি ও অন্যদিকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের রহস্য কি তা বিশ্বের শিল্প মহলের কাছে বর্তমানে আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সেই সংক্রান্ত প্রযুক্তির বিকাশের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। [বিবিসি নিউজ]

১৮.●বৃটিশ কুমেরু সমীক্ষা'র সাথে যুক্ত বিজ্ঞানীরা পূর্ব কুমেরু অঞ্চলে ২৮০০ মিটার গভীরে বরফ সংগ্রহ করেছেন। এই বরফে ১২ লক্ষ বছরের পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা, বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণ ইত্যাদি কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার তথ্য লুকিয়ে রয়েছে এই নমুনায়। স্মরণ করা যেতে পারে অতীতেও এমন গবেষণা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ রাশিয়ান বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে ভস্তক আইস কোর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত চারবার ও ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ইতলীয় বিজ্ঞানীদের উদ্যোগে এই নমুনা সংগ্রহের কাজ হয়েছে। এখন পর্যন্ত সংগৃহীত নমুনা থেকে সর্বাধিক ৮ লক্ষ বছরের পরিবেশের ইতিহাস জানা গেছে, বর্তমান গবেষণায় তা বেড়ে দাঁড়াবে ১২ লক্ষ বছর। [বৃটিশ আন্টার্কটিক সার্ভে]

২২.●জাপানের গবেষকেরা LAHB নামে একটি প্লাস্টিকের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে প্লাস্টিকটি জৈব বিয়োজনক্ষম বা বায়োডিগ্রেডেবল। সমুদ্রের নিচে প্রায় ৮৫৫ মিটার গভীরে কম তাপ ও লবনের অধিক ঘনত্বে ১৩ মাস রাখার পর প্লাস্টিকের ৮২% ক্ষয় লক্ষ্য করা গেছে। এই গবেষণা আগামীদিনে সমুদ্রে প্লাস্টিক দূষণের সমাধান করবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। [ইউরেকঅ্যালার্ট]

২৫.●মার্কিন গবেষণা সংস্থা নাসা'র বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে পৃথিবীর সাথে গ্রহাণু YR4-এর সংঘর্ষের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের অনুমান যে ঐ গ্রহাণু ২০৩২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে যদিও তার সম্ভাবনা মাত্র ৪.৩%। আজ পর্যন্ত এমন সংঘর্ষ সরাসরি প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা মানুষের নেই, তাই এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত কৌতুহলী। [সিএনএন]

৩০.●চিনের পিকিং ও রেনমিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে সিলিকন ওয়েফার স্কেলের উপর দ্বিমাত্রিক ইন্ডিয়াম-সেলেনাইড সেমিকন্ডাক্টর বানাতে সক্ষম হয়েছেন। এই উদ্ভাবন ইলেকট্রনিক দুনিয়ায় রীতিমতো আলোড়ন তুলেছে কারণ এর কার্যকারিতা উচ্চ মানের যা কম্পিউটিংকে আরও উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন করে তুলবে। [ইউরেকঅ্যালার্ট]

বিজ্ঞানের বিশেষ খরব ঃ

পুরানো তত্ত্বের খন্ডন করে হিমালয় সৃষ্টির আধুনিক বৈজ্ঞানিক মডেল জন্ম নিল

আমরা জানি যে আজ থেকে প্রায় ৫ কোটি বছর আগে ভূআলোড়ণ জনিত বা টেকটনিক বলের প্রভাবে ভারত (হিমালয় বাদে ভারতীয় উপমহাদেশ) এবং এশিয়ার পূর্বভাগের কিছু অংশ বাদে বাকি অংশের (এবং ইউরোপ ভূখন্ডের একাংশ, যাকে ইউরেশিয়া বলা হয়) সঙ্গে এক মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই প্রবল সংঘর্ষের ফলে তিব্বতের প্রায় ১০০০ কি.মি দৈর্ঘ্যের অঞ্চল সঙ্কুচিত হয়। ইন্ডিয়ান টেকটনিক প্লেট এর একাংশ তুলনায় ভারি হওয়ার ফলে পিছলে ইউরেশিয়ান প্লেটের নিচে প্রবেশ করে। এই প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর ভূত্বকের বেধ (thicknes) হিমালয়ের নিচে দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং হিমালয়ের বিশাল উচ্চতার জন্য এই ঘটনা প্রধান ভূমিকা পালন করে।

সুইজারল্যান্ডের ভূতত্ত্ববিদ এমিলি অ্যারাগ্যান্ড তাঁর দ্বারা প্রকাশিত ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের গবেষণায় এটাই প্রমাণ করে দেখান এবং বলেন যে হিমালয় পর্বতমালার নিচে পৃথিবীর ভূত্বক প্রায় ৭০-৮০ কি.মি বেধের এবং এই কারণেই হিমালয়ের উচ্চতা এত বিশাল। একশ বছর আগের তুলনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনেক বিকাশ ঘটেছে। প্লেট টেকটনিক তত্ত্ব বর্তমানে আর মডেলের স্তরে দাঁড়িয়ে নেই। এই তত্ত্ব আজ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর অভ্যন্তরের গুণ ও বৈশিষ্ট্যও বহুলাংশে মানুষের হাতের মুঠোয় এসেছে উন্নত প্রযুক্তির কারণে।

একশ বছর পর বিজ্ঞানী এমিলি অ্যারাগ্যান্ডের পুরানো তত্ত্ব তাই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খন্ডিত হয়েছে। জন্ম নিয়েছে হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টির আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংশোধিত মডেলের।

সম্প্রতি ইতালির মিলানো-বিকোক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েটেড প্রফেসর পিয়েত্রো স্টারনাই এবং তার সহযোগী বিজ্ঞানীরা হিমালয় পর্বতমালার নিচস্থ প্রস্তরগুলির উপর গবেষণা চালিয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনীত হয়েছেন। বিশ্বের ভূবিজ্ঞানী মহল একে স্বীকৃতি দিয়েছে। গত ৩০শে অগাস্ট ২০২৫ লাইভ সায়েন্স জার্নালে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

লাইভ সায়েন্স পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিজ্ঞানী পিয়েত্রো স্টারনাই বলেন "যদি আপনি ৭০ কি.মি গভীর ভূত্বক (crust) এর কথা ধরে নেন তবে তার নিচের অংশ কার্যত নমনীয়, প্রসারণশীল (ductile) হয়ে উঠবে ভূগর্ভস্থ প্রবল উষ্ণতার জন্য এবং কার্যত তা দই এর চেহারা নেবে। আপনি নিশ্চই দই এর উপর বিশাল পর্বত সৃষ্টি কল্পনা করবেন না।"

এমিলি আরগ্যান্ডের তত্ত্ব অনুসারে হিমালয় পর্বতমালার নিচে তিব্বতীয় ভূত্বকের নিচে ভারতীয় মহাদেশের ভূত্বকে ঢুকে হিমালয় পর্বতের নিচে ভূত্বকের বেধ প্রায় ৭০-৮০ কি.মি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা পৃথিবীর মধ্যে হিমালয়ের নিচেই ভূত্বকের বেধ সর্বোচ্চ। আমরা সকলেই জানি ভূত্বকের রাসায়নিক গঠন ও ভৌত ধর্ম গুরুমন্ডলের রাসায়নিক গঠন ও ভৌত ধর্মের এক প্রকার নয়। গুরুমন্ডল যে তাপমাত্রায় কঠিন থাকতে পারে ভূত্বক তা পারে না ভিন্ন রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য হওয়ায়। কিন্তু অ্যারাগ্যান্ডের তত্ত্ব এর ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম ছিল। তাছাড়া হিমালয় পর্বতমালার অভ্যন্তরে সরাসরি গুরুমন্ডল থেকে সৃষ্ট আগ্নেয়শিলার (আল্ট্রাস্যাফিত প্রস্তর) উপস্থিতিও পুরানো তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করায় সমস্যা ছিল।

আধুনিক গবেষণা থেকে এটা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে অতীতের তত্ত্বকে খুঁটিয়ে বিচার করা হয় নি যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রায় ৪০ কি.মি গভীরতায় ভূত্বকের গলন শুরু হয় ভূঅভ্যন্তরস্থ অতি উষ্ণ তাপমাত্রার জন্য।

বর্তমান গবেষণায় গবেষকরা হিমালয়ের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন পাথরের থেকে সরাসরি এবং ভূকম্পজনিত তরঙ্গের সাহায্যে (Seismic Study) অপ্রত্যক্ষভাবে তথ্যগুলি সংগ্রহ করে পদার্থের ভৌতধর্মগুলি বিভিন্ন তাপমাত্রা ও চাপে কী রকম হয় তার বিস্তারিত গবেষণার পর ১০০ বছর ধরে চলে আসা মডেলকে খন্ডন করে নতুন আধারে নতুন বৈজ্ঞানিক মডেল প্রতিষ্ঠা করেছেন। (চিত্র-১)

প্রফেসর পিয়েত্রো স্টারনাই এর গবেষণাপত্রের সহলেখক কিং ফাহদ ইউনির্ভাসিটি অফ পেট্রোলিয়াম এন্ড মিনারেল, সৌদি আরবের প্রফেসর সিগোনে পিল্লা লাইভ সায়েন্স পত্রিকাকে সাক্ষাৎকারে বলেন "এতদিন যা রহস্যময় মনে হত তা এখন

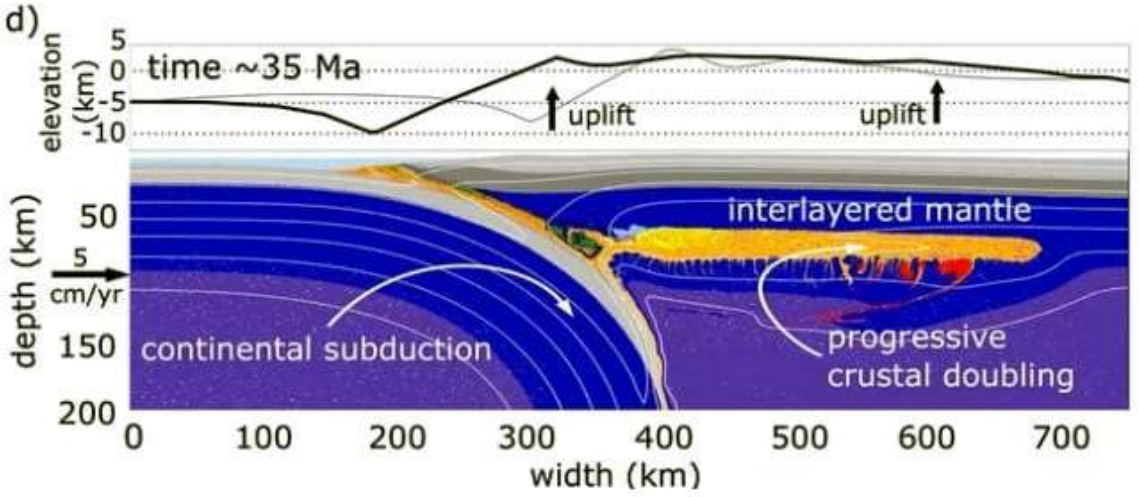

চিত্র-১

[ছবিতে দেখানো হয়েছে ভারতীয় প্লেটের ভূত্বকের অংশ কিভাবে ইউরেশিয়ান লিথোস্ফিয়ারের নিচে প্রবেশ করেছে দুই প্লেটের সংঘর্ষের ফলে। (ছবিটি স্টারনাই ও সহযোগী ২০২৫, টেকটনিক্স পত্রিকা থেকে সংগৃহীত)]

সহজে নতুন মডেলের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। যেখানে ভূত্বক (Crust), গুরুমন্ডল (Mantle), ভূত্বক (Crust) হিমালয়ের নিচে এরকম স্তরীভবনই বাস্তব।" তিনি আরও বলেন যে বর্তমান গবেষণালব্ধ মডেল দৃঢ় প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এমিলি অ্যারাগ্যান্ডের ১০০ বছরের পুরানো মডেল দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত নন এমন বিজ্ঞানী অ্যাডাম স্মিথ (স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট) লাইভ সায়েন্স পত্রিকাকে বলেন "আমি মনে করি বর্তমান গবেষকরাই সঠিক এবং পুরানো তত্ত্ব বিতর্কিত। কারণ অতীতের সকল গবেষণায় বলা হয়েছে হিমালয় শুধুমাত্র ভূত্বক দ্বারা সৃষ্ট।" তিনি বলেন যে বর্তমান গবেষণা বিশ্বাসযোগ্য কারণ তা হিমালয়ের অপরিসীম ভূতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। এই ক্ষেত্রে গবেষকরা হিমালয়ের সকল অংশের, সকল স্তরের বেধ, ভৌতধর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে হিমালয়ের নিচে দুটি প্লেটের ভূত্বকের মধ্যবর্তী স্থানে গুরুমন্ডল (Mantle) এর উপস্থিতি আছে।

এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত নন অপর বিজ্ঞানী অধ্যাপক দাউ ভ্যান হিনসবার্জেন (নেদারল্যান্ডের উত্রেচট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল টেকটনিক-এর অধ্যাপক) লাইভ সায়েন্স পত্রিকাকে ই-মেইলে জানান "এটা একটা সুন্দর আবিস্কার এবং একটি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা। যদি একটি মহাদেশ অন্য একটি মহাদেশের নিচে নেমে যায় তবে আপনি উপরের (তিব্বত) প্লেটের ভূত্বক ও গুরুমন্ডলের উপরের অংশ বা লিথোস্ফিয়ার পাবেন এবং নিচে নিচস্থ (Subducting) প্লেটের (ভারত) ভূত্বক পাবেন।"

অর্থাৎ হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টির আধুনিক সংশোধিত মডেল অনুসারে আজ থেকে প্রায় ৫ কোটি বছর আগে ভারতীয় প্লেটের সঙ্গে ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষে (Collision on Convergent Plate Margin) ইউরেশিয়ান প্লেট (ভূত্বক ও গুরুমন্ডলের উপরিভাগ) এর নিচে ইন্ডিয়ান প্লেটের ভূত্বক পৌঁছায় এবং বর্তমানে উচ্চ উষ্ণতায় তা গলিত অবস্থায় বিরাজ করছে (চিত্র-১)। এই বৈজ্ঞানিক মডেল ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের মডেলের অসঙ্গতিকে বৈজ্ঞানিকভাবে সমাধান করল। ■

[তথ্যসূত্র ঃ 'দ্য জিওলজি দ্যাট হোল্ডস আপ দ্য হিমালয়াস ইস নট উই থট'-সাসচা পারে, লাইভ সায়েন্স জার্নাল, ৩০শে অগাস্ট ২০২৫]

শব্দের খেলা

– সৌমিলী মিত্র রায়

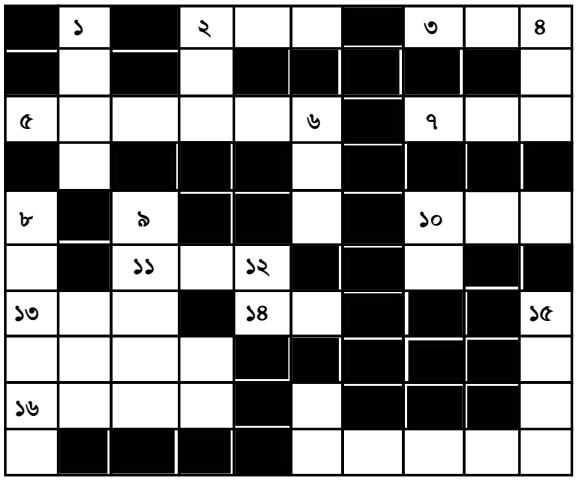

বিগত সংখ্যার উত্তর

পাশাপাশি	উপরনিচ
১. আইনস্টাইন	১.আমলকী
৩. কোষ	২. কচুরিপানা
৬. ক্যালকুলাস	৪. শন
৯. অ্যাসিড	৫. কলা
১১. টন	৭. লব
১২. সুন্দরবন	৮. নিউটন
১৪. করবী	৯. অ্যাসিটিক
১৬. জনন	১০. আকন্দ
১৭. স্যাকারিন	১৩. রমন
	১৫. বীজ

পাশাপাশি

২. সবচেয়ে নরম খনিজ (৩)

৩. চায়ে থাকা উত্তেজক (৩)

৫. দ্বিবীজপত্রী গাছে সমান্তরাল শিরাবিন্যাসযুক্ত পাতা, প্রথম বারে রাজা, শেষ দুয়ে চাঁপা (৬)

৭. খাদ্য যে গ্রহণ করে (৩)

১০. তুঁতে, চিনি যার উদাহরণ (৩)

১১. রেশম কাপড় বিশেষ (৩)

১৩. পাইন গাছের আঠা (৩)

১৪. তন্তু ও তৈলজাতীয় ফসল (২)

১৫. পশলা বিশেষে ব্যবহৃত পাতা (৪)

১৮. পরমাণুর ঋণাত্মক কণা (৫)

উপরনিচ

১. সোনালি রঙা পরজীবী লতা,দ্বিবীজপত্রী হয়েও নাই বীজপত্র (৪)

২. চামজ ট্যান করতে ব্যবহৃত যৌগ (৩)

৪. নীলাভ সবুজ শৈবাল বিশেষ ঘাস যা বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে

৬. বটজাতীয় বৃক্ষ (৩)

৮. সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের প্রবক্তা (৬)

৯. মিশ্রণ পৃথকীকরণের পদ্ধতি (৩)

১২. পরিমাপের প্রাচীন একক (২)

১৬. মহাকর্ষ সূত্রের প্রবক্তা (৪)

১৭. ঝালজাতীয় এ সবজি অনেকের প্রিয় (২)

(সমাধান আগামী সংখ্যায়)

সমীক্ষা ঃ

অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে চলমান আন্দোলন প্রসঙ্গে জনমত সংগ্রহ

অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে যে গণআন্দোলন চলমান তাতে আমাদের সংগঠন বিজ্ঞান মনস্ক সংগঠন অংশীদার। এই আন্দোলনের একবছর পূর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে আমরা বিভিন্ন ইউনিটে অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম। আমরা এই জনমত সংগ্রহ কর্মসূচী নিয়েছিলাম কলকাতার বেহালা ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে, সোনারপুরে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার লক্ষ্মীকান্তপুর, পাথরপ্রতিমা গ্রামাঞ্চলে, উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ এবং উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন গ্রামে। এছাড়া অন্যান্য ইউনিটগুলি এই আন্দোলনের প্রচার কর্মসূচী নিয়েছিল। পুরুলিয়াতে 'আরেক অভয়া' মিঠাই মণির খুনের সুবিচার চেয়ে ও অভয়ার ন্যায় বিচার চেয়ে গ্রামের মেয়েদের প্রতিবাদ মিছিল হয়েছিল, তাকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা দিয়েছিল এখানকার ইউনিট। এখন শহর এবং গ্রামের অনুসন্ধানের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট রাখা হচ্ছে।

সোনারপুর অঞ্চলে নরেন্দ্রপুর স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে ২ দিন এবং বৈকুণ্ঠপুরে ১ দিন এই অনুসন্ধানমূলক কর্মসূচী রাখা হয়েছিল। প্রায় ৬০টি পরিবারের কাছে যাওয়া হয়েছিল, এছাড়া বাজারে, স্টেশন চত্বরে, দোকানে আসা-যাওয়ার পথে বহু পথচলতি মানুষ, জটলা করে থাকা লোকজেনর সঙ্গে কথাবার্তা বলা হয়। এই মানুষের অধিকাংশই কোনো না কোনো রোজগারের জন্য কর্মরত। লিঙ্গ নির্বিশেষে একদম বেরোজগার গৃহবাসী নেই বললেই চলে।

মহিলাদের অধিকাংশেরই পেশা গৃহপরিচারিকা, পিওন, বিক্রেতা, টেলারিং-এর কাজে যুক্ত মানুষ। পুরুষরাও প্রায় সবাই শ্রমজীবী মানুষ।

এঁদের বক্তব্যে যেটা মূলত উঠে এসেছে, তা হল বিচার (সুবিচার) পাওয়া যায় নি, আরো লাগাতার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, অন্য কিছু করতে হবে, তবে তা ঠিক কি জানা নেই। আন্দোলনটা চলুক। অভয়ার বিচার চেয়ে লড়াই যে চলমান, তা তাঁরা জানেন এবং একবছর আগে পথে নেমেছিলেন সকলেই।

পাথরপ্রতিমা অঞ্চলে অনুসন্ধান হয়েছে একদম গ্রামে। প্রায় ২৫টা বাড়িতে যাওয়া হয়েছে। এছাড়া বাজারে, জটলায় পথচলতি মানুষের সঙ্গেও কথা হয়েছে। এখানকার প্রায় সকল মানুষই চাষের মরসুমে চাষবাস আর অন্য সময় বাইরে চলে যান কাজের সন্ধানে, অর্থাৎ প্রবাসী শ্রমিক। মেয়েরা বাড়ির কাজের পাশাপাশি চাষের কাজ, জনমজুরি বা সেলফ হেল্প গ্রুপে কাজ করেন। এঁরা সবাই একবছর আগে মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন, স্লোগানে গলা মিলিয়েছিলেন। আজ সেভাবে আন্দোলনের ময়দানে না থাকলেও অভয়ার সুবিচার চেয়ে যাঁরা লড়াই করছেন, তাঁদের প্রতি সমর্থন রয়েছে। বিচার কিভাবে পেতে পারি তা নিজে থেকে কেউ বলতে পারেন নি। তবে লড়াই জারি থাকুক, এমনটাই তাঁদেরও চাহিদা।

লক্ষ্মীকান্তপুরের গ্রামে প্রায় ৩৫টা বাড়িতে যাওয়া হয়েছিল। এছাড়া ৮-১০ জন মানুষের জটলায় এমন ৫টা জায়গায় গিয়ে জনমত সংগ্রহ করা হয়েছে। পুরুষদের জটলা যেমন বৈঠকখানা, ঠাকুর দালানে তেমনি মেয়েদের জটলা বাচ্চাদের নিয়ে খেলার মাঠে, বটতলার সামনে, পুকুরঘাটে গিয়ে আমরা জনমত সংগ্রহ করেছি ও অভয়া আন্দোলনের সমর্থনে প্রচার করেছি। এছাড়া লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে অভয়ার ন্যায়বিচারহীন একবছরে ৯ই অগাস্ট রাখীবন্ধন কর্মসূচী চলাকালীন আমরা বহুমানুষের মধ্যে অনুসন্ধান করেছিলাম। প্রায় কুড়িজন ছাত্রীর সঙ্গেও কথা হয়েছে। এই অনুসন্ধান যাদের মধ্যে হয়েছে, তাদের মধ্যকার পুরুষরা সবাই শ্রমজীবী, মহিলাদের ৮০ শতাংশই গৃহস্থালির কাজের পাশাপাশি কোনো না কোনো রোজগারের জন্য শ্রমজীবী। এঁদের মধ্যকার আবার ১০ শতাংশ এলাকা ছেড়ে বাইরে কাজ করতে যান। মেয়েদের কাজের ধরন – শোলার ফুল তৈরি, মাটির শিল্প, কাপড়ে চুমকি বসানোর কাজ, কলকাতায় গৃহপরিচারিকার কাজ।

এখানকার অধিকাংশ মানুষ অভয়া মঞ্চের নাম না শুনলেও আর জি করের ঘটনা সবাই মনে রেখেছেন। অনেকে বলেছেন – 'এইরকম একটা ঘটনা এত সহজে ভোলা যায়?' তাঁরা অনেকে বলেছেন – 'বিচার আমরা সকলেই চাই, কিন্তু বিচার দেবে কে? সকলেই তো সাক্ষ্যপ্রমাণ চাপা দিতে চাইছে। যারা বিচার করবে, তারাই তো সব চাপা দিতে চাইছে।' কিন্তু কিভাবে ন্যায়বিচার আসবে এ সম্পর্কে কোনো নিজস্ব ভাবনা তাঁদের নেই। একটাই কথা 'আন্দোলনটা চালিয়ে যেতে হবে।' আমরা ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে যাঁদের মধ্যে গেছি তাঁদের নিজের থেকে সমাধান হিসেবে বিদ্যমান সরকার বদল, বিষয় হিসেবে উঠে আসে নি। আমাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে শুধুমাত্র লক্ষ্মীকান্তপুরেই নয়, শহর-গ্রাম-শহরতলীর সর্বত্র যেখানে এই অনুসন্ধান হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আরেকটা সাধারণ সাদৃশ্য পাওয়া গেছে যে পুরুষরা এই খুন-ধর্ষণকে নিন্দা করলেও মেয়েদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদে যে, আন্তরিকতা দেখা গেছে তাতে বলা যায় এ বিষয়টা যেন

তাঁদেরই বিষয়। আমরা এমন কিছু সাক্ষাৎকারের অংশ সরাসরি তুলে ধরবো। তবে এমন অনেক অভিব্যক্তি, বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ, চোখে-মুখের অব্যক্ত ভাষা আমরা মহিলাদের মধ্যে দেখেছি যা এই প্রশ্নে তাঁদের পুরুষদের থেকে স্বতন্ত্র করে।

উত্তর ২৪ পরগণার **বনগাঁ** শহর সংলগ্ন গ্রামে আমরা অনুসন্ধান চালাই। মোটমুটি ৬০টা পরিবারের কাছে বাড়ি বাড়ি যাওয়া হয়। এখানকার মহিলাদের পেশা বিড়ি বাঁধা, দড়ি পাকানো, ইত্যাদি। এছাড়া মাঠে চাষের কাজ তো আছেই। অধিকাংশই শ্রমজীবী। পুরুষরাও জমিতে চাষের কাজ করে আর সময় সুযোগ পেলে অন্য রাজ্যে চলে যান। এঁদের মধ্যে ধান রোয়ার কাজ করতে অন্ধ্রপ্রদেশে এবং অনেকেই নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন রাজ্যে চলে যান। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গেও কথাবার্তা হয়েছে। এখানকার অধিকাংশ মানুষ অভয়া মঞ্চের নাম জানেন না। তবে আর জি করের ঘটনাটা জানেন, এঁরা সকলেই সে সময় পথে নেমেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও ক্ষোভ আছে। কিন্তু সবারই বক্তব্য 'একটা ঝটকা এসেছিল। এখন রেশটাও নেই'।

এই অঞ্চলে শাসকদল ঘনিষ্ঠ এনজিও'দের মারফৎ অনেকেরই কাজের সংস্থান হয় বলে মন খুলে কথা বলার ক্ষেত্রে সন্ত্রস্ত।

কলকাতার বেহালা ঠাকুরপুকুর অঞ্চলের অনুসন্ধান হয়েছে শতাধিক বাড়িতে গিয়ে। এছাড়া দোকান, অটোস্ট্যান্ড-রিক্সাস্ট্যান্ড, আড্ডার জটলাতে, পথচলতি মানুষের কাছে আমরা গেছি। মতামত সংগ্রহ করেছি। আমরা এখানে প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষকে পেয়েছি যাঁরা বয়সের কারণে বাড়িতে থাকেন, গৃহস্থালীর কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে যুক্ত নন। কিন্তু তাঁরা পরিবারের বাকি সদস্য-সদস্যাদের অনুপস্থিতিতে বাড়ির সব কাজ ও ছোট ছেলে-মেয়েদের যাবতীয় দেখাশোনা করেন বা বার্ধক্যের কারণে একেবারে গৃহবন্দী, বাকিদের মধ্যকার কমবয়সীদের মধ্যে রোজগারের জন্য কর্মক্ষেত্রে সকালে গিয়ে রাতে ফেরার ঘটনা লিঙ্গ নির্বিশেষে সমান সমান।

আমরা যে সমস্ত পেশাজীবী লোকজনের মধ্যে গেছি তারা গৃহবধূ, চাকরীর পাশাপাশি ছোট ব্যবসা (যেমন কম্পিউটার), আইটি সেক্টরে কর্মরত, বয়স্ক রিটায়ার্ড সরকারি কর্মচারী, স্কুল টিচার ও টিউশনি পড়ানো শিক্ষিকা, বেসরকারি চাকুরীজীবী, রেলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও তাঁর গৃহবধু, স্টেশনারি মহিলা দোকানদার, শুধুমাত্র বাড়ি বাড়ি ঠিকা কাজ করে। দিনগুজনার করেন এমন বয়স্কা মহিলা, গৃহপরিচারিকা, মহিলা চায়ের দোকানদার, বাড়িতে সেলাই-এর কাজ করে এবং পড়াশোনা করে এমন অল্পবয়সী মেয়ে, জামাকাপড় বিক্রেতা, কর্মহীন বেকার, বিমা কোম্পানির এজেন্ট ও ব্যবসায়ী, সরষের তেলের দোকানদার, ছোটব্যবসায়ী ও তাঁর স্ত্রী, গৃহবন্দী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ডাক্তার (এমআর বাঙ্গুর হাসপাতাল), স্বাস্থ্যকর্মী, দোকানে উপস্থিত মধ্যবিত্ত ক্রেতা, দাঁতের ডাক্তার, বস্তিবাসী মুসলিম ধর্মাবলম্বী বৃদ্ধা ও তাঁর ছেলের বৌ, ঐ এলাকার অন্যান্য শ্রমজীবী নারী-পুরুষ-স্কুল ছাত্রী, ছাত্র, মাংস বিক্রেতা, একটি এনজিও কর্মী, নার্স, নাট্যকর্মী ও সরকারী কর্মচারী, ইলেকট্রিশিয়ান, হিন্দুত্ববাদী, উদ্বাস্তু, উকিল ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে যাঁরা সংখ্যালঘু ধর্মালম্বী অঞ্চলের, তাদের অনেকের কাছে অভয়ার থেকে বাংলাদেশী সন্দেহে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে উৎপীড়ন চলছে, তার বিরুদ্ধে সংবেদনশীলতা বেশি দেখেছি, যদিও এই অঞ্চলেও মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে অভয়ার বিচার না পাওয়াটা প্রবল নাড়া দিয়েছে। তারা কিছু ভোলে তো নিই, তখনকার চলমান প্রতিটা ঘটনা তাঁদের চোখে ভাসে। উল্লিখিত মানুষের কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি।

গৃহবধু ঃ এক গৃহবধু আমাদের উপস্থিতি দেখে বলেন – 'আবার রাত দখল হবে?

উত্তরে সম্মতি জানিয়ে আমরা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাই। উনি বলেন – 'একদম অন্যরকম। সে ঠিক আছে, ওটা মেয়েদের একদম পারসোনাল সমস্যা। আমি গেছি আমার মনের তাগিদে। আপনি আপনার মনের তাগিদে। কেউ কাউকে জোড় করেনি। এটা কোনো রাজনৈতিক দলের বিষয় নয়। আমরা অভয়ার ন্যায় বিচার চাই। এখনো তা আমরা পাই নি।'

এক স্কুল পড়ুয়া ছেলের মা, যে নিজে গৃহবধু, স্বামী ছোট ব্যবসায়ী, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম – 'তোমাদের মূল্যায়ন কি? কি করা উচিৎ?

আমরা যেদিন গেছিলাম তার আগের সপ্তাহেই কসবা ল কলেজের ধর্ষণের ঘটনাটা ঘটেছিল। এদিকে এই ঘটনা, অন্যদিকে অভয়ার সুবিচারহীন একবছর। এমন পরিস্থিতিতে তিনি প্রতিক্রিয়া দেন – 'কি বোলবো বল তো? আমার মনে হয় আমার তরফ থেকে কাজ একটাই ছেলেকে ঠিকভাবে মানুষ করতে হবে। এখন বাইরেটা কীভাবে ঠিক করবো বলতো? আমরা ছেলেদের এত বেশি প্রশ্রয় দিয়ে মানুষ করি যে তারা এমন হয়। এখন রাজনৈতিক প্রশাসনিক ব্যাপারগুলোতো আমার হাতে নেই। আমি কিছু করতে পারবো না।'

আমরা বলি – 'বাড়ির বাইরের পরিবেশেও তারা যায়। বাড়িতে ভালো শিক্ষা পেলেও বাইরেটা কিভাবে মোকাবিলা করবে তারা?' উত্তরে তিনি বলেন – 'কি করে বলি বলো তো, তোমার নৈতিকতা, চারিত্রিক গুণগুলো তোমাকে তোমার মধ্যে রাখতে হবে। আরেকটা জিনিস হল আশে পাশে অন্যায় দেখলে প্রথমদিনই প্রটেস্ট করতে হবে।

তিনি আরো বলেন – 'আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে কোনো শাস্তির ব্যবস্থা নেই বলে আজকে এত বাড়বাড়ন্ত।'

আমরা বলি – 'এই সিস্টেম যারা চালাচ্ছে, কি মনে হয়,

তারা শাস্তি দেবে?'

উত্তরে বলেন – 'আরো তো ঘটছে। প্রশ্রয় দিচ্ছে। এত বড় ঘটনা, যদি ধামাচাপা দেওয়া হয়, প্রশাসনের এক একটা ক্ষেত্রে আপনার আমার ঘরের লোকইতো থাকে, তাদের ঘরেও তো ছেলে-মেয়ে রয়েছে।'

তিনি বলেন – 'পুলিশ এখন গুন্ডাবাহিনী, আমার মতে।' আমরা বলি – 'একত্রিতভাবে আমাদের তো থাকা দরকার'! উত্তরে তিনি বলেন – 'হ্যাঁ, এটা কোনো দলের ব্যাপার না। তাই দল নির্বিশেষে এক হওয়ার দরকার।'

একজন স্টেশনারি ছোট মহিলা দোকানদারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে আসা যাক, আমরা তাঁকে বলি – 'সকলেই তো একটা জ্বালা যন্ত্রণা থেকে এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কি? উত্তরে তিনি বলেন – 'আমি তো কিছুই ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি না, সব পয়সায় ঢাকা পড়ে যাবে। কিছু হবে না দেখুন। একবছর হয়ে গেল, কোনো কিনারা হয় নি। আর আদৌ হবে? আমার তো মনে হয় কিছু হবে না। আমরা তবু আন্দোলন করবো। যাতে বিচার হয়। এটা যেন বিচার পায়। আশা তো করেই যাবো। আমাদের পশ্চিমবাংলার যা অবস্থা, হবে না। মানে কি বলবো, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। উকিল দিয়ে প্রতিদিন বিশাল টাকা খরচ করে চেষ্টা করছে কালপ্রিটগুলো যাতে না সামনে আসে।'

আমরা বলি – 'এই বিচার ব্যবস্থায় কোনো আস্থা আছে?' উত্তরে বলেন – 'সেই তো দেখছি, উপর থেকে ইঙ্গিত দেবে যেরকম বিচার করবে সে রকমই।'

আমরা বললাম – 'তার মানে সিস্টেমেরই একটা গলদ আছে?' উনি বললেন – 'সিস্টেমেরই তো'।

আমরা বললাম – 'এই আন্দোলনটা যদি আগের মতো চলতো, আমরা কি সুবিচার ছিনিয়ে আনতে পারতাম?' উত্তরে তিনি বলেন – 'আন্দোলনই করতে হবে, গণআন্দোলন না হলে হবে না।' আমরা বললাম – 'তা হলে একটা প্রেশার ক্রিয়েট হবে। একটা চাপ সৃষ্টি হবে।' উত্তরে বললেন – 'হ্যাঁ, কাকে বিশ্বাস করবো। আন্দোলন না চালালে কিছু হবে না, এটা থামতে দেওয়া যাবে না।'

একজন আইটি সেক্টরে কর্মরত ব্যক্তিকে অভয়া আন্দোলন সম্পর্কে মূল্যায়ন কী তা জানতে চাওয়া হয়। উত্তরে বলেন – 'মূল্যায়ন? একজন ডাক্তার যে অন ডিউটি মারা গেল, তার আলটিমেটলি কোনো বিচার হয় নি। কোনো বিচার হল না। বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থাই উঠে যাবে। এটা পরিষ্কার কথা। ফার্স্ট কথা এটা, লাস্ট কথাও এটা, কোনো বিচারই হয় নি, এটা কোনো বিচার ব্যবস্থাই নয়। বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কখন থাকে, যদি দোষী সাজা পায়, দোষীর সাজাটা কি হয়েছে? কে আদৌ দোষী সেটাই বের করতে দিলো না।'

উনি বলেন – 'এত চাপেও রাজনৈতিক নেতারা যা করার করছে।' আমরা বলি – 'এই জন্য আমরা মনে করি সাধারণ মানুষের চাপটা থাক। তারপর দেখা যাক।' উনি একথা শুনে বলেন – 'যদি অবস্থার উন্নতি না করা হয়, আরো কঠোর না করা হয়, তাহলে এরকম জিনিস ঘটবে এবং ভবিষ্যতেও হবে। যে কারণে মানুষ কিছু কিছু জায়গায় নিজের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে। জানছে যে কিছু হবে না। সব মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নেবে। এতে নেতাদের মান থাকবে না। তা হলে আর সরকারের প্রয়োজনীয়তা কি? ডেমোক্রেসিতে আইন আইনের পথে চলবে। মানুষের কথার দাম নেই।

শেষে বলেন – 'মানুষের মনে অবশ্যই দাগ কাটার মতো জিনিস এটা। সবাই পাশে থাকবো।'

অসুস্থ বলে ঘর থেকে বেরোতে পারেন না এমন একজন মধ্যবিত্ত অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আমরা আমাদের লিফলেটটা দিয়ে বলি – 'আমাদের লিফলেটটা নিন, পড়ুন, অন্যকে বলুন।' বৃদ্ধের স্ত্রী বলেন – 'হ্যাঁ। কোনো কিছু শাস্তি হল না তো, তাদের তো ধরে রেখেছে। কি করলো?' আমরা বলি – আপনার কি মনে হয়, কিছু হবে?'

উত্তরে বৃদ্ধ বলেন – 'কিচ্ছু হবে না, কোনো কিছু হবে না।' সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা বলেন – 'পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা দরকার। কোনো শাসন আছে নাকি'।

আমরা তাঁদের বলি – 'কোনো আস্থাই কি নেই বিচার ব্যবস্থার প্রতি? উত্তরে বৃদ্ধ বলেন – 'না। হবে না। এটা অন্যরকম লোকের হাতে চলে গেছে। তারা লুকিয়ে লুকিয়ে চলছে।' বৃদ্ধা বলেন – 'পার্টির ব্যাপার হয়ে গেছে। তখন যদি পাবলিকের হাতে দিতে, মারের চোটে, সবাই একঘা করে দিলে ...'

এবার আসা যাক স্কুলের এক শিক্ষিকার সাক্ষাৎকারে। আমরা অভয়া আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাই। তিনি বলেন – 'দেখো, আমরা তো নিজেরা যুক্ত হতে চাইছিলাম। কিন্তু আমাদের স্কুল সেটা একেবারেই চাইছে না। ছাত্রছাত্রীরা যে বেড়িয়েছে, আমরা স্কুল থেকে একটা (মিছিল) অরগানাইজ করার চেষ্টা করেছিলাম। ওনারা বললেন – না এটা সম্ভব নয়, কারণ আমরা মাইনরিটি ইস্কুল। উনি বললেন এগুলোতে তোমরা ঢুকো না, কারণ আমরা সাপোর্ট করতে পারছি না। যা হয়, আমরা প্রাইভেটলি গেছিলাম। কিন্তু স্কুল থেকে আর করতে পারলাম না।' আমরা তাঁকে এরপরে প্রশ্ন করি – '১৪ই অগাস্ট তো নারী স্বাধীনতার আওয়াজ উঠেছিল। এটা নিয়ে মতামত কি?' তিনি উত্তরে বলেন – 'এটা নিয়ে তো কিছুই হল না। যেটা আমরা চেয়েছিলাম, আমি তো এখানকার মেয়ে নই। যেটা আমার ভালো লেগেছিল, এখানে সবাই একজোট হয়ে থাকে। এই

ঘটনাটার পরে তো, কেমন একটা ব্যাপার, এটা নিয়ে কোনো কিছুই হল না। একদম ভোঁ ভোঁ করে উড়ে গেল। কিছু বলার নেই, কিচ্ছু করার নেই। কেউ কিছুই করতে পারলো না, বড় মাথাই ধরা পড়ল না।' আমরা তাঁকে প্রশ্ন করলাম – 'এই আন্দোলন কিভাবে চললে লক্ষ্যে পৌঁছন যাবে?' এর উত্তরে বলেন – 'সমাধান তো আমি নিজেই খুঁজে পাচ্ছি না। আমি সত্যিই জানি না। তবে এটা মেনে নিতে পারছি না।'

একজন গৃহপরিচারিকা বলেন – 'সত্যি খুবই দুঃখজনক। মেয়েটা বিচার তো পেলোই না, তার উপর এমন ঘটনা বেড়েই চলেছে। রাত দখলে গেছিলাম। মানুষকে জেগে উঠতে হবে।' আরেকজন বলেন – 'সবার বাড়ি থেকেই কিছু কিছু গেছিল। এদের তো কোনো লজ্জাই নেই। সব সময় তো বেড়োতে পারবো না, খরচাও তো আছে।' 'সবাইকে লড়াই করতে হবে।'

এক মধ্যবয়সী মহিলা শ্রমজবীকে আমরা জিজ্ঞাসা করি – 'দিদি, ১৪ তারিখের রাত দখলে ছিলেন? কেমন লেগেছে?' উত্তরে বলেন – 'ভালো লেগেছিল। আবার খারাপও লাগছে।' আমরা বলি – 'কিছু সুবিচার হল না বলে খারাপ লাগছে?' উনি উত্তরে বলেন – 'সত্যিই তাই। কিচ্ছু তো হচ্ছে না।' আমরা বলি – 'কি জন্য হল না বলুন তো?' জবাবে বলেন – 'বলা তো অনেক কিছুই যায়, কি আর বলবো।'

আরেক জন শ্রমজীবী মহিলা বললেন – 'আমাদের মতে কিছু হবে না। গরীব মানুষ, খেটে খাই। তবে বিচার পাওয়া উচিৎ। আমরা চাইবো ন্যায় বিচার পাক। গরীব মানুষ এটুকুই চায়।' অন্যান্য প্রত্যেক শ্রমজীবী মেয়েরা একই সুরে বলেছেন – 'সকলের যা মতামত, আমাদেরও তাই। বিচারটা যেন পায়।'

আমাদের অনুসন্ধানকালে একজন মহিলা উকিলের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় তাঁর বাড়িতে।

আমরা প্রশ্ন করি – 'আপনারা কি আন্দোলনের সময় গেছিলেন?' উত্তর আসে – 'না'।

আমরা প্রশ্ন করি – 'আবার ৯ তারিখ পথসভা, ১৪ তারিখ রাত দখল হতে চলেছে, এই যে বিচার হল না, এ বিষয়ে কি বলবেন?'

উত্তর দেন – 'আমি নিজেই (এই প্রফেশনে) আছি'।

আমরা তাঁকে প্রশ্ন করি – আপনি তো জানেন বিচার কিছুই হল না। তার পাশে আবার ল-কলেজের ঘটনাটা ঘটলো। আপনি আইন পেশায় আছেন। এ বিষয়ে আপনাদের মূল্যায়ন কী?

জবাবে খুব নির্লিপ্তভাবে বলেন – 'জুডিসিয়ারির যা অবস্থা। দিন দিন যা হচ্ছে।' এই কথা বলে থেমে যান। বোঝা যায় পেশাগত কারণে উনি মনখুলে কথা বলতে পারছেন না।

আমরা অভয়া মঞ্চ বিরোধী একজন বিজেপি সমর্থককেও অনুসন্ধানকালে পেয়েছি, যিনি অভিযোগ করেছেন যে আমরা বিজেপি'কে আন্দোলনে ঢুকতে দিইনি বলে। তিনি আবার ৯ই অগাস্ট ২০২৫-এর নবান্ন অভিযানে আমাদের যোগ দিতে আহ্বান করেন। ইনি মধ্যবিত্ত মানুষ। এনার পাশাপাশি আরেকজন খেটে খাওয়া বয়স্ক মানুষের সাক্ষাৎকারও আমরা পেয়েছি যিনি হিন্দুত্ববাদী। তাঁর কাছে চলমান আন্দোলনের মূল্যায়ন কি জানতে চাওয়া হয়। তিনি জবাবে বলেন – 'আমার মূল্যায়নটা যদি বলি, বলা ঠিক নয়, আমরা তো কাজ করে খাই। আমাদের বললে কিছু হবে না। যদি সরকার কিছু না করে, আমি আপনি আন্দোলন করে কিছু হবে না।'

আমরা জবাবে বলি – 'সেই জন্য আমাদের একমাত্র একজোট হওয়া ছাড়া আর কী কিছু করার আছে?' উত্তরে তিনি বলেন – 'এই একজোট কোনোদিন হতে পারব না। হিন্দুরা কোনোদিনই একজোট হবে না।'

সবাই তো খারাপ না, ভালোও আছে। ওদের মধ্যে (মুসলমান) একতা বেশি। আমাদের মধ্যে সেইটা নেই।'

আমরা এই দুইক্ষেত্র ছাড়া বাকি কোনো মানুষের কাছে নেতিবাচক বক্তব্য পাইনি। আমরা দেখেছি মুসলিম প্রধান শ্রমজীবী এলাকায় অভয়া ছাড়াও অন্যান্য উৎপীড়নের খবরও সমানভাবে তাঁদের নাড়া দিচ্ছে। অভয়ার সুবিচার তাদেরও দাবি হিসেবে উঠে এসেছে। এমনই একটা বাড়ির রোয়াকে বসে থাকা দুজন মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা নীচে তুলে ধরলাম। এঁদের একজন বৃদ্ধ, আরেকজন তাঁর ছেলের বৌ।

প্রশ্ন ঃ এই যে অভয়ার বিচার হল না, কি বলবেন?

উত্তর ঃ কারোর তো শাস্তিই হল না, একজনকে ধরে রেখে দিয়েছে। আর ও যে একা, তা তো না। ওর সাহস হবে না এতবড় কাজটা করার। আমরাও তো মেয়ে। ওকে ধরে নিয়ে যায় যখন তখন বলেছিল, 'আমি নিদোর্ষ, আমাকে ফাঁসিয়েছে। সন্দীপ (ঘোষ) আমাকে ফাঁসিয়েছে।' সবটার মাথা হল সন্দীপই। আর কে যে যুক্ত আছে জানি না। তবে খবর দেখি আমরা। কষ্ট হয়, যে তার বাপ-মা'র কত কষ্ট, তাদের কি হল? কিছু হল? – কলেজে হল আবার (এখানে কসবা ল কলেজের কথা বলা হচ্ছে)।

প্রশ্ন ঃ মহিলারা যেখানে কাজ করতে যাবে, কোথাও নিরাপত্তা আছে কি?

উত্তর ঃ না নেই।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু ঘর থেকে তো বেড়োতেই হবে, মেয়েদের ঘরেই শুধু রেখে দেওয়া যাবে না। তাহলে কি হবে? আপানি কি অভয়াকে নিয়ে হওয়া মিছিলে বেড়িয়েছিলেন?

উত্তর ঃ না গো, পায়ে ব্যথা। একদিন বেড়িয়েছি। পাড়ায় সবাই একদিনই বার হয়েছিল। আর বেশি পারিনি।আমরা বিচার পাই নি।

আর বিচার পাবেও না। বিচার পাবার জন্য কত কষ্ট করেছে

ছাত্রছাত্রীরা, তারপরে ঐসব তক্তোপোষ ফেলে না-খেয়ে, না-দেয়ে, কেউ বিচার দিল? মমতার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে গেল, উনি রাজি হল, আবার রাজি হল না, আবার নিজে গেল, কিছু একটা হল। আমরা তো মুরুখ্খু মানুষ। আমরা কিছু জানি না। ওরাতো শিক্ষিত মানুষ, তাও বিচার পেল না।

প্রশ্ন ঃ আপনার কি মনে হয়? আন্দোলন কি চালিয়ে যাওয়া উচিৎ?

উত্তর ঃ উচিৎ চালিয়ে না গেলে আমরা হেরে যাবো। মা কোনোদিন হারে। মা, মাই হয়, মা-র জায়গা কেউ নিতে পারে না। মা-কে চালিয়ে যেতে হবে।

আমরা স্বাস্থ্যকর্মী, নার্স, ডাক্তারদের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। তাঁদের কেউ প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার, কেউ সরকারি হাসপাতালের কর্মী। এখানে একজন ২০ বছর ধরে কর্মরত সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার বাবুর কাছে জানতে চেয়েছিলাম সমস্ত স্তরের (সিনিওর, জুনিয়র, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ মানুষের) যৌথ প্ল্যাটফর্ম কেন গড়ে উঠলো না। উত্তরে উনি বলেন –

উত্তর ঃ এখন এটা কি বলুন তো, এভাবে আলোচনা করে বলা যাবে না, কারণটা ভেতরে।

প্রশ্ন ঃ মানে মতবিরোধ আছে ভেতরে?

উত্তর ঃ থাকতেই পারে। কোন্ কাজে না মতবিরোধ নেই বলুন তো।

জবাবে আমরা বলি – 'ঠিক কথা, সংসারে....

উত্তর ঃ কোন্ কাজে মতবিরোধ নেই। আপনি একটা ব্যাঙ্কে যান, অফিসে যান, স্কুলে যান, সব অ্যাডমিটিস্ট্রেশনে মতবিরোধ আছে, এটা থাকবেই। এটা চিরাচরিত ব্যাপার। কেউ আটকাতে পারবে না। দু'টো দলের মতভেদ থাকবে। দুটো দল থাকবেই। আমি স্যারকে নিয়ে থাকবো, ওরা স্যারের থেকে আলাদা থাকবে। আলাদা একটা ইউনিয়ন করবে, এতো সব জায়গাতে, পশ্চিমবঙ্গ কেন ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই।

আমরা মন্তব্য করি – এরা এক হলে আরো ভালো হোত।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সেতো হতো। এখন সেইসব মহাপুরুষরা তো আর নেই, স্বাধীনতার আগে যাঁরা ছিলেন। সেই মানসিকতাও নেই। তখন একটা ইউনিটি ছিল। সেই জিনিসটা এখন আর নেই তো।

আমরা মন্তব্য করি – তবে আমরা সাধারণ মানুষ খুব প্রত্যাশী ছিলাম।

উত্তর ঃ সবাই ছিল, যারা না বুঝতো তারাও বেড়িয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনি কোন মেডিকেল কলেজে আছেন?

উত্তর ঃ আমি এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে আছি। কোভিডের পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাজ করাচ্ছে। যেহেতু রিক্রুটমেন্ট বন্ধ, ডাক্তারের সংখ্যা কম ...

প্রশ্ন ঃ সরকার এরকম পলিসি নিয়েছে? এটা কি ডেপুটেশনে পাঠানো বলে? এটা কি সব জায়গায় হচ্ছে?

উত্তর ঃ আন অফিসিয়াল ডেপুটেশন।

আমরা বর্তমানে হাসপাতালের ডাক্তারদের মানসিক অবস্থা কি তা জানতে চাই।

উত্তরে বলেন – জুনিয়র ডাক্তাররা যাঁরা আন্দোলনে যোগদান করেছিল, তাঁদের একটা মনের জোড় ছিল যে আমাদের সাথে সিনিয়ররাও আছে, এবং পারস্পরিক আরো অনেক লোকজন আছে। কিন্তু এখন জুনিয়র ছেলে যারা, তাদের স্বাভাবিক একটা ভয় থাকবে, যে আমাদের সামনে ভবিষ্যৎ আছে। সেই ভবিষ্যতের চিন্তা করেই হয়তো অতটা অ্যাগ্রেসিভ হয়নি। এটা কিন্তু স্বাভাবিক। একটা ছেলে, যে এন্ট্রান্সে চান্স পেয়ে, ডাক্তারি পড়ে, পাশ করার পরে যখন দেখে যারা আন্দোলন করছে তাদের পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে যাচ্ছে, তখন তো সে ভাববেই 'আমার কি দরকার আন্দোলনে যাবার। আমি মনে মনে রাখি। বাইরে যাবো না, দেখাবো না, ক্যামেরার সামনে আসবো না। ক্যামেরার সামনে এলেই আমার বিপদ।' – এটাতো স্বাভাবিক, আমি পাশ করেছি আজকে কুড়ি বছর হয়ে গেছে। আর এখন যে ছেলেটা পাশ করবে, তার মানসিকতা তো এক হবে না। ... সিনিয়ররা ডাকছে, জুনিয়ররা হয়তো যেতে চাইছে না, তাদের কেরিয়ারের ভয় আছে। কিন্তু মনের ভিতরে সুপ্ত বীজের মতো যেন জিনিসটা থাকে, সেটা যেন দমে না যায়।

শিলিগুড়ি শহরের একজন যুবতীর সঙ্গে কথা হয়। উনি আন্দোলনে প্রথম থেকে সক্রিয়। প্রশ্ন করা হয় – এই আন্দোলন কি পিতৃতন্ত্র বিরোধী বলে মনে করেন? জবাবে তিনি বলেন – 'অবশ্যই। তবে পিতৃতন্ত্র জেন্ডারভিত্তিক হয় না। এটা সিস্টেম থেকে আসে। একটি মেয়ে বিয়ের পর শাশুড়ির দ্বারা নির্যাতিতা হয় আবার নিজে শাশুড়ি হলে বৌমাকে নির্যাতন করে। দেখছেন না মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা?'

আমরা যে অল্পকটা সাক্ষাৎকার এখানে তুলে ধরলাম সেটার বৈচিত্র্য অনেক থাকলেও প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন সুবিচারের জন্য গণআন্দোলন চলুক, অব্যাহত থাকুক। এই অভয়া আন্দোলন যে জুনিয়র ডাক্তারদের থেকে শুরু হয়েছিল, তাঁদের মনোবল আজকে কোথায়, সেটা যেমন উঠে এসেছে। তেমনি এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে ডাক্তারি সমাজ ও নাগরিক সমাজ সেই নেতৃত্ব যে সংস্কার চেয়েছিলেন, তার সমর্থনে কিন্তু হাজির হয়েছিলেন নানা পেশায় যুক্ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিত্তের শ্রমজীবী নারী ও পুরুষ। দাবি ছিল কর্মক্ষেত্রে উৎপীড়ন বন্ধ করার, হুমকী সংস্কৃতির খতম এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কার। এই দাবির সমর্থনে এই শ্রমজীবীরা সামিল হয়েছিলেন বলেই এই জনজোয়ার এসেছিল। এটা যেন আমরা না ভুলি। ■

সংগঠন সংবাদ ঃ

২০শে অগাস্ট ২০২৫
জাতীয় বিজ্ঞানমনস্কতা দিবস উদযাপন

বিজ্ঞান মনস্ক **সোনারপুর ইউনিটের** পরিচালনায় কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে ২০ অগাস্ট ২০২৫ সোনারপুর থানার অন্তর্গত কালিকাপুর রামকমল বিদ্যাপীঠ (উচ্চ মাধ্যমিক)তে পালিত হলো জাতীয় বিজ্ঞানমনস্কতা দিবস ২০২৫।

বিদ্যালয়ের একটি বড় কক্ষে প্রায় অষ্ট থেকে দশম শ্রেণী মিলিয়ে প্রায় ২০০ ছাত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তিনজন সহ শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শহীদ ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। কয়েকজন ছাত্র শহীদ ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকারের প্রতিকৃতিতে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় আজকের দিনে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানমনস্কতার গুরুত্ব নিয়ে সুন্দর বক্তব্য রেখে আমাদেরকে বিজ্ঞানমনস্কতা দিবসের কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব অর্পণ করেন। প্রথমেই আমাদের এক সাথী পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকার সমন্ধে ছাত্রদের অবহিত করেন ও তারপর আজকের দিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সেই সাথে ব্রুনো, গ্যালিলিও, দাভোলকার, গৌরী লঙ্কেশ, অভিজিৎ রায় প্রমুখের আদর্শ তুলে ধরে সহজ করে বিজ্ঞান কী, বৈজ্ঞানিক তথ্য কী, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কী, বৈজ্ঞানিক যুক্তি কী, বিজ্ঞানী কারা, বিজ্ঞানমনস্কতা কী, বিজ্ঞানমনস্ক কারা? কেন আমরা বিজ্ঞান মনস্ক হবো? তা ব্যাখ্যা করেন। আরেক সাথী অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অপবিজ্ঞানের স্বরূপ উন্মোচন করে বিজ্ঞানমনস্কতা বিকাশে বাধাগুলি কী কী তা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে উপস্থাপন করেন। সেইসাথে বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানমস্কতা বিকাশে ছাত্রসমাজের দায়িত্ব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেন।

এরপর এক সাথী 'গ্রহের ফেরে নয়, বিজ্ঞানের আলোকে' এই শীর্ষক গ্রহরত্ন ও জীবাশ্ম নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও কিছু গ্রহরত্ন ও ফসিল দেখিয়ে ছাত্রদের সামনে জ্যোতিষ সহ সমস্তরকম অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের স্বরূপ উন্মোচন করেন। ছাত্রদের ফসিল ও গ্রহরত্ন হাতে নিয়ে স্পর্শ করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। সেইসাথে সভাকক্ষের সামনের দিকে জীবাশ্ম ও গ্রহরত্ন প্রদর্শিত হয়। ছাত্রদের এই সব সম্বন্ধে আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। এরপর চলে প্রশ্নোত্তর পর্ব। বহু ছাত্র নানান প্রশ্ন করেছে। আমরা সাধ্যমত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা আমাদের মুগ্ধ করেছে। তারা স্বতস্ফূর্তভাবে আমাদের করা ডিভিওতে তাৎক্ষণিক ভালো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। অনুষ্ঠানে সমীক্ষণের সর্বশেষ দুটি সংখ্যা ডিসপ্লে করা হয়েছিল। কয়েকজন ছাত্র তা সংগ্রহ করেছে। অনেকে সংগ্রহ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে কয়েক কপি সমীক্ষণ দিয়ে আসি। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি তারমধ্যে কিছু কপি ছাত্রছাত্রীরা সংগ্রহ করেছে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সমীক্ষণ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ সবার আন্তরিক সহযোগিতা ও আতিথেয়তা আমাদের মুগ্ধ করেছে। ভবিষ্যতে এই ধরনের অনুষ্ঠান স্কুলে করার জন্য প্রধান শিক্ষক তাদের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরাও ছাত্রদের বিজ্ঞান আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য ও তাদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারের জন্য এমন অনুষ্ঠান ভবিষ্যতে আরও করার প্রয়াস রাখব।

বেহালা-ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে ঐদিন সদস্য এবং কয়েকজন ছাত্রদের নিয়ে শহীদ নরেন্দ্র দাভোলকরের জীবন এবং বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারে বাধা কোথায় তা আলোচনা হয়।

পাথরপ্রতিমা ইউনিটে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঐ সভাটি ১৫ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৫ জন সদস্য এবং সমর্থককে নিয়ে বিজ্ঞান মনস্কতা কী, বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারে বাধা কোথায় ইত্যাদি নিয়ে একটি মনজ্ঞ আলোচনা হয়। ■

সংগঠন সংবাদ ঃ

অভয়া ন্যায় বিচার আন্দোলন

৯ই থেকে ১৪ই অগাস্ট অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে একটি লিফলেট প্রস্তুত করা হয় এবং এক মাস আগে থেকে বাড়ি বাড়ি প্রচার করার কর্মসূচী নেওয়া হয় এবং এই আন্দোলন নিয়ে সাধারণ মানুষের মতামত তুলে আনার চেষ্টা করা হয়।

বেহালা শাখার কর্মীরা জুলাই মাস থেকে বাড়ি-বাড়ি ও পথচলতি মানুষের মতামত নেয়, লিফলেটিং এবং প্রচার করে। ঠাকুরপুকুর এলাকার অনেক অঞ্চলেই যাওয়া হয়। এছাড়া বেহালা প্রতিবাদী মঞ্চেও এই প্রতিবাদী মঞ্চের ও প্রতিটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে। ৯ই অগাস্ট সকালে অভয়ার রাখি পরানো হয়। বিকেল চারটের সময় অভয়া মঞ্চের 'চলো কালীঘাট' প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে এই শাখা। এরপর ওই দিন রাত ৮টায় ঠাকুরপুকুর পোড়া অশ্বত্থতলায় প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয় এবং প্রচুর সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমাগম হয়। ১৪ই অগাস্ট প্রতিবাদী মঞ্চের সখেরবাজারের সমাবেশে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এই শাখা।

সোনারপুর শাখা সংযুক্ত সংগ্রাম কমিটির সাথে যৌথ প্রোগ্রাম নেয়। বাড়ি-বাড়ি লিফলেটিং, প্রচার কর্মসূচীর পাশাপাশি পথসভার আয়োজন করে, তবে ৭ই অগাস্টে বৃষ্টির জন্য একটি পথসভা বাতিল হয়। ১২ই অগাস্ট নরেন্দ্রপুরের পথসভায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ভালো হয়। ৯ই অগাস্ট সকালে অভয়া মঞ্চের রাখি বন্ধন হয় এবং বিকেলে হাজরায় কেন্দ্রীয় জমায়েতে অংশগ্রহণ করা হয়। ১৪ই অগাস্টে সোনারপুর মোড়ে রাত দখলের ডাক দেওয়া হয়। তবে সেদিন সকালেই জানা যায় ওই একই জায়গায় সোনারপুর অভয়া মঞ্চ নামে একটি সংগঠনও রাত দখলের ডাক দেয়। এই ব্যাপারে আমাদের সংগঠনের জানা ছিল না। একই জায়গায় শাসকদলও উচ্চস্বরে মাইক বাজিয়ে প্রোগ্রাম বাতিল করার চেষ্টা করে। পাশাপাশি দুটি প্রোগ্রাম হয় উচ্চস্বরে মাইক বাজিয়ে। সোনারপুর শাখার কর্মীরা তখন একটু দূরে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে লিফলেটিং করে।

বনগাঁ শাখার কর্মীরাও বাড়ি-বাড়ি লিফলেটিং, প্রচার প্রোগ্রাম নেয়। ৯ই অগাস্ট বনগাঁ জিয়ালা বল্লভপুর স্কুল মোড়ে বিকালে রাখি বন্ধন ও পথসভা হয়। ১৪ই অগাস্ট বিকালে কালিতলাতে 'উই নিড জাস্টিস' ব্যাচ পথ চলতি মানুষ ও আশেপাশের দোকানদারদের পরানো হয়। একটি পথসভা হয়। সাধারণ মানুষ তাতে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

গোচরণ এলাকায়ও লিফলেট বিতরণ হয়। প্রচার হয় সংযুক্ত সংগ্রাম কমিটির সাথে যৌথ ভাবে। ৯ই অগাস্ট সকালে রাখি বন্ধন হয়। ১৪ই অগাস্ট গোয়ালবেড়িয়ায় রাত দখলের ডাক দেওয়া হয়, তাতে সাধারণ মানুষ অংগ্রহণ করেন।

লক্ষ্মীকান্তপুরেও বাড়ি-বাড়ি লিফলেটিং ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলা হয়। ৯ই অগাস্ট সকলে রাকি বন্ধন হয় ও বিকালে হাজরায় কেন্দ্রীয় কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা হয়। ১৪ই অগাস্ট লক্ষ্মীকান্তপুর গাববেরিয়া বাজার সংলগ্ন গোষ্ঠতলার মাঠে জমায়েত ও পথসভা হয়। মহিলাদের সমাবেশ আরও একবার জানিয়ে যায় তাদের প্রতিবাদ জারি আছে।

পাথরপ্রতিমা শাখার কর্মীরা অখিল ভারতীয় প্রগতিশীল ছাত্রমঞ্চের সাথে যৌথভাবে বাড়ি-বাড়ি লিফলেটিং ও প্রচার করেন। ৯ই অগাস্ট সকালে রাখি বন্ধন অনুষ্ঠান হয়। ১৪ই অগাস্ট হরিমন্দির বাজার এলাকায় ঐতিহাসিক রাত দখলের স্মরণে পথসভা হয়।

এছাড়া 'বৃহত্তর বারাসাত'-এ আমাদের **বারাসাত শাখার** কর্মীরা সমস্ত কর্মসূচীতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন।

আসানসোলে ৯ই অগাস্ট বিএনআর মোড়ে আমাদের শাখার উদ্যোগে যাবতীয় কার্যক্রম প্রবল বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। ১৪ই অগাস্ট ওই একই জায়গায় মোমবাতি জ্বালিয়ে স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

৯ই অগাস্ট বিকালে হাজরায় কেন্দ্রীয় সমাবেশে হাওড়া আমতা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও অন্যান্য এলাকার সমস্ত কর্মীরা আমরা যোগদান করি।

নবদ্বীপে আমাদের সদস্যরা ১৪ই অগাস্ট রাধাবাজার-এর জমায়েত থেকে লিফলেটিং করেছেন।

শিলিগুড়িতে ১৪ই অগাস্ট বাঘা যতীন পার্ক থেকে হাসমি চক অবধি মিছিলে আমাদের সদস্যরা থেকেছেন ও লিফলেটিং করেছেন।

ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুরের রাত দখল ও ৯ই অগাস্টের কর্মসূচীতে আমাদের পাঠকরা হাজির ছিলেন।

পুরুলিয়ার জয়পুর থানায় 'গণজাগরণ মঞ্চ'র ডাকে সংগঠিত প্রতিবাদী মিছিলে আমাদের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছেন। এই মিছিলে সাড়ে তিনশ'র বেশি স্থানীয় গ্রামীণ জনতা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৪ই অগাস্ট পুরুলিয়ার রেল স্টেশনে সোস্যাল মিডিয়া'তে ডাকা একটি রাত দখলের কর্মসূচীতে আমাদের কর্মীরা অংশগ্রহণ করে। ■

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরিরাম আহমেদ

(অষ্টম পর্ব চর্তুদশ অংশ)

বিগত সংখ্যায় পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ঘিরে থাকা অস্থির ইলেকট্রনের অবস্থান ও ভরবেগ নির্ণয়ের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এই অনিশ্চয়তা প্রকৃতিরই নিয়ম। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসারে এই প্রাকৃতিক নিয়মকে আমরা কিভাবে দেখবো? আমরা ইতিমধ্যে পর্যায়ক্রমিক অনেকগুলি পরীক্ষাতে, গাণিতিক নির্ণয়ে দেখেছি এই অতিপারমাণবিক জগতে বস্তুর পরিবর্তনশীলতা, অর্থাৎ গতির কারণ হল তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব হল দুই বিপরীত গুণের। এই দুই গুণের একটি বস্তুর কণা বৈশিষ্ট্য, অন্যটি তার তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য। এই দুই অবিচ্ছিন্ন গুণের দ্বন্দ্ব গতির কারণ। কিন্তু এই গুণের পরিমাণগত পরিবর্তন যে গুণগত স্থানান্তর ঘটনায় (বস্তুর এক গুণ থেকে অন্য গুণে স্থানান্তরণ) তার জন্য পরিমাণের পরিবর্তন প্রয়োজন। এই পরিমাণকে কিভাবে, কতদূর মাপা যাবে, সেটাই হল হাইজেনবার্গের 'অনিশ্চয়তা নীতি'। হাইজেনবার্গ তাঁর লিখিত 'ফিজিক্স অ্যান্ড ফিলোজফি, দ্য রিভল্যুশন ইন মর্ডান সাইন্স' [বঙ্গানুবাদে 'পদার্থ বিজ্ঞান এবং দর্শন, আধুনিক বিজ্ঞানে বিপ্লব] গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রায় পুরোটাই আমরা ভাবানুবাদ করলাম। কারণ এই রচনাংশটি অতিপারমাণবিক বস্তুর গুণগুলি চিহ্নিত করেছে কালক্রমানুসারে। গুণগুলির অন্তদ্বন্দ্বকে বারবার প্রকট করেছে। তাদের রূপান্তরে যে গুণের পরিমাণগত পরিবর্তন প্রয়োজন সেই পরিমাণটি নির্ধারণে বিজ্ঞানী মহলের দীর্ঘ সাধনার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র আমরা পেয়েছি এখানে। আসুন রচনাংশটির ভাবানুবাদ থেকে বিষয়গুলি বোঝার চেষ্টা করি। অনুবাদের শেষে আমরা কিছু কিছু পূর্বে অনালোচিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ টীকার আকারে দেবো।

এই রচনাংশ কোয়ান্টাম তত্ত্বের সৃষ্টি ও কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা গড়ে ওঠা পর্যন্ত। কোয়ান্টাম তত্ত্ব যেমন গুণগুলির সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যেভাবে ক্রমান্বয়ে জেনেছেন তা তুলে ধরেছে, তেমনি কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার অংশ গুণের পরিমাপ নির্ধারণের ধারাবাহিক প্রয়াসকে তুলে ধরেছে। সব শেষে এই দুই বিপরীত গুণের দ্বন্দ্বের পরিণতি সম্পর্কেও লিখেছেন হাইজেনবার্গ। ফলে কোয়ান্টাম তত্ত্বে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ব্যাখ্যা পূর্ণতা পেয়েছে এই রচনায়। মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতে এই অন্বেষণ অবিরত চললেও এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য আজ মানুষের জানা। আসুন রচনাটি অধ্যয়ন করা যাক ঃ

"কোয়ান্টাম তত্ত্বের উৎপত্তি একটি বহুল পরিচিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে, যা তৎকালীন পারমাণবিক পদার্থ বিজ্ঞানের মূল অংশ

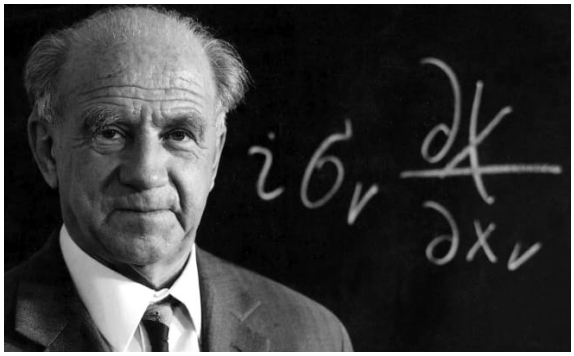

বিজ্ঞানী ওয়ার্নার কার্ল হাইজেনবার্গ

ছিল না। যখন কোনো পদার্থ উত্তপ্ত হয়, এক সময় সেটি জ্বলে ওঠে, আরো উত্তাপে লাল থেকে সাদা অবস্থায় পৌঁছায়। উত্তপ্ত পদার্থটির বর্ণ মূলত তার পৃষ্ঠতলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না; **ব্ল্যাক বডির**[*১] জন্য এটি কেবলমাত্র তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। সুতরাং উচ্চ তাপমাত্রায় এমন এক ব্ল্যাক বডি থেকে নিঃসৃত বিকিরণ ভৌত গবেষণার জন্য উপযুক্ত বিষয়; এটি এমন একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা বিকিরণ ও তাপের পরিচিত সূত্রের মাধ্যমে সহজে ব্যাখ্যা করা উচিৎ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লর্ড রেলে ও জিন্স এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন এবং তাঁরা এক গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হন। এখানে সহজ কথায় এসব সমস্যা বোঝানো যাবে না। এক কথায় বলতে গেলে, এখনও পর্যন্ত পরিচিত সূত্রের প্রয়োগে কোনো গ্রহণযোগ্য ফলাফল আসেনি। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে যখন প্লাঙ্ক এই গবেষণায় প্রবেশ করেন, তিনি এসে সমস্যাটিকে বিকিরণ থেকে বিকিরণকারী পরমাণুর দিকে স্থানান্তরিত করেন। এই স্থানান্তর প্রকৃত সমস্যাগুলো দূর করেনি, বরং বাস্তব তথ্যের (পরীক্ষালব্ধ তথ্যের) ব্যাখ্যা সহজ করেছে। ঠিক তখনই, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে গ্রীষ্মে, বার্লিনে কার্ল বাউম এবং রুবেন্স ব্ল্যাকবডির বিকিরণ – স্পেকট্রামের (অর্থাৎ বর্ণালীর) অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট নতুন পরিমাপে সক্ষম হন। প্লাঙ্ক যখন এই ফলাফলগুলো জানতে পারেন, তিনি সহজ গাণিতিক সূত্র দিয়ে এগুলো বর্ণনা করার চেষ্টা করেন, যেগুলো তাঁর তাপ ও বিকিরণের সাধারণ সংযোগ নিয়ে গবেষণায় যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। একদিন প্লাঙ্কের বাড়িতে একটি চায়ের আড্ডায় রুবেন্স তার পাওয়া সর্বশেষ

ফলাফলের সঙ্গে প্লাঙ্কের প্রস্তাবিত নতুন সূত্রকে তুলনা করেন। এই তুলনাকালে দেখা যায় রুবেন্সের পাওয়া তথ্য প্লাঙ্কের প্রস্তাবিত সূত্রে সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে। **এভাবেই আবিষ্কার হয় প্লাঙ্কের তাপ বিকিরণের সূত্র।**

এটি একই সঙ্গে প্লাঙ্কের জন্য বিরাট এক তাত্ত্বিক কাজের শুরু ছিল। নতুন সূত্রের সঠিক ভৌত ব্যাখ্যা কী? প্লাঙ্ক তাঁর আগের কাজ থেকে সহজেই নিজের সূত্রটিকে বিকিরণকারী পরমাণু (তথাকথিত দোলক) সংক্রান্ত হিসেবে পরিণত করতে পারতেন। তিনি শীঘ্রই আবিষ্কার করেন তাঁর সূত্রটি এমন যেন দোলকটি কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কোয়ান্টাম ধারণ করতে পারে – এমন একটি ফলাফল যা ক্লাসিকাল পদার্থ বিজ্ঞানের পরিচিত যেকোনো কিছুর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, তাই প্রথমে তিনি সহজে তা বিশ্বাসই করতে পারেন নি। কিন্তু ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মে প্রচন্ড কাজের চাপের মধ্যে এক সময়ে তিনি নিজে এই সিদ্ধান্ত না নিয়ে পারলেন না। প্লাঙ্কের পুত্রের লিখিত এক বর্ণনায় জানা যায়, বার্লিনের নিকটবর্তী এক শহরতলির গ্রুনেভাল্ড অরণ্যে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ কালে প্লাঙ্ক তাঁকে এই নতুন চিন্তাধারা সম্পর্কে বলেছিলেন। এই সময় তিনি ব্যাখ্যা করেন যে সম্ভবত তিনি প্রথম সারির কোনো আবিষ্কার করে ফেলেছেন – সম্ভবত নিউটনের আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনীয় কিছু। তাই তখনই তিনি এটা অনুভব করেন যে **তাঁর সূত্রটি প্রকৃতিকে বর্ণনার ভিত্তিকে ছুঁয়েছে এবং একদিন এই ভিত্তিগুলো তাদের প্রচলিত অবস্থান থেকে সড়িয়ে এক নতুন, অজানা স্থিতাবস্থার দিকে নিয়ে যাবে।** প্লাঙ্ক, যিনি সব ব্যাপারে রক্ষণশীল ছিলেন, একেবারেই এই পরিণতি আশা করেননি, তবুও ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নিজের কোয়ান্টাম ধারণা প্রকাশ করেন।

শক্তি কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শক্তি কোয়ান্টাতে নিঃসৃত বা শোষিত হতে পারে – এই ধারণাটি এতটাই নতুন ছিল যে এটি প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞানের কাঠামোয় খাপ খায় না। পুরানো বিকিরণ সংক্রান্ত সূত্রের সঙ্গে তাঁর এই নতুন অনুসিদ্ধান্ত মেলানোর চেষ্টাও মূলগতভাবে ব্যর্থ হয়। কেবল পাঁচ বছর পরে নতুনভাবে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্ভব হয়।

এবার আগমন ঘটল অল্পবয়সী এক পদার্থ বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক প্রতিভা, আলবার্ট আইনস্টাইনের। যিনি পুরনো ধারণা থেকে দূরে সরে যেতে ভয় পাননি। তাঁর দুটি সমস্যায় তিনি এই নতুন ধারণা কাজে লাগাতে পারলেন। তারমধ্যে একটি ছিল তথাকথিত ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট – আলো ধাতুর উপর পড়লে তা থেকে ইলেকট্রনের নিঃসরণ হওয়া। বিশেষ করে লেনার্ডের পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গিয়েছিল নিঃসৃত ইলেকট্রনের শক্তি আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে না, কেবলমাত্র এর রঙ বা আরো নির্ভুলভাবে, এর কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে। **প্রচলিত বিকিরণ তত্ত্ব দিয়ে এর ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল না।** আইনস্টাইন প্লাঙ্কের অনুমানকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যে আলো শক্তির কোয়ান্টা (অর্থাৎ কণা – অনুবাদ) হিসেবে এই মহাবিশ্বে চলমান – প্রতিটি আলোর কোয়ান্টার শক্তি তার কম্পাঙ্ককে প্লাঙ্ক ধ্রুবক দিয়ে গুণ করে পাওয়া যাবে।

অন্য সমস্যাটি ছিল কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ (specific heat)। প্রচলিত তত্ত্ব অনুযায়ী উচ্চ তাপমাত্রায় আপেক্ষিক তাপের মানগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু নিম্ন তাপমাত্রায় তা মিলছিল না। আবারও আইনস্টাইন দেখাতে পারলেন যে এই আচরণকে বোঝা যায়, যদি কোয়ান্টাম ধারণাকে প্রয়োগ করা হয় কঠিন পদার্থের পরমাণুর স্থিতিস্থাপক কম্পনের উপর। এই দুটি ফলাফল ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। কারণ এগুলো দেখিয়েছে প্লাঙ্কের ক্রিয়াকলাপ, তাঁর নামাঙ্কিত ধ্রুবক অনেক ঘটনাতে উপস্থিত আছে, যাদের সরাসরি তাপ বিকিরণের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলি একই সঙ্গে কোয়ান্টাম ধারণার যুগান্তকারী চরিত্রও উদ্‌ঘাটন করেছিল, কারণ প্রথমটি আলোকে প্রচলিত তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি রূপে বর্ণনা করে। আলোকে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব অনুসারে একটি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ হিসেবে দেখা হত, আবার আলোকে শক্তির কোয়ান্টা হিসেবে, মহাবিশ্বে উচ্চ গতিতে চলমানকারী শক্তির প্যাকেট হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেত।

কিন্তু এটি কি একই সঙ্গে উভয়ই হতে পারে? আইনস্টাইন জানতেন **ডিফ্রাকশন**[*২] এবং **ইন্টারফিয়ারেন্স**[*৩] এর মতো ঘটনাগুলি কেবলমাত্র তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য দিয়েই বর্ণনা করা যায়। **তিনি আলোর কোয়ান্টাম ধারণা এবং তরঙ্গ ধারণা-র মধ্যকার বৈপরীত্যকে অস্বীকার করেন নি, বরং ভেবেছিলেন এই বিষয়টি পরে বুঝে নেওয়া যাবে।**

এর মধ্যে বেকারেল, ক্যুরি এবং রাদারফোর্ডের পরীক্ষাগুলি পরমাণুর গঠন সম্পর্কে কিছু স্পষ্টতা এনেছে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে রাদারফোর্ডের পদার্থের মধ্য দিয়ে এক্স রশ্মি পাঠানোর পরীক্ষার মাধ্যমে তার বিখ্যাত পরমাণু মডেল থেকে জানা যায় যে পরমাণুতে একটি কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস থাকে, যা ধনাত্মক চার্জযুক্ত এবং পরমাণুর মোট ভরের প্রায় সবটুকু ধারণ করে, আর ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের চারপাশে সূর্যের চারপাশে থাকা গ্রহের মতো ঘুরে থাকে। বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর মধ্যে রাসায়নিক বন্ধন ব্যাখ্যা করা হয় এক পরমাণুর তার পার্শ্ববর্তী পরমাণুগুলির বাইরের (কক্ষের) ইলেকট্রনগুলির মিথস্ক্রিয়া (interation) হিসেবে; এটি সরাসরি নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। নিউক্লিয়াস তার চার্জের মাধ্যমে পরমাণুর রাসায়নিক আচরণ নির্ধারণ করে, যা পরবর্তীতে নিরপেক্ষ পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যাকে স্থির করে। শুরুতে এই পরমাণু মডেলটি পরমাণুর সবথেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য – তার স্থিতিশীলতাকে বোঝাতে পারে নি। নিউটনের গতিবিদ্যা অনুসরণ করে বলা যাবে না কোনো গ্রহমন্ডল অন্য কোনো সমগোত্রীর

সঙ্গে সংঘর্ষের পর তার প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারে। কিন্তু উদাহরণ স্বরূপ কার্বন মৌলের একটি পরমাণু সর্বদাই কার্বন পরমাণুই থাকে সংঘর্ষের পর বা মিথস্ক্রিয়া (interation)-র পর।

এই অস্বাভাবিক স্থিতিশীলতার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বোরের দ্বারা প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম ধারণাকে প্রয়োগের মাধ্যমে। বোরের কোয়ান্টাম ধারণা দেখালো যদি পরমাণু শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে পারে, যার মধ্যে নিম্নতম হল পরমাণুর সাধারণ অবস্থা, তবে কোনো ধরনের সংঘর্ষের পরেও সর্বদা তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

কোয়ান্টাম তত্ত্বকে পরমাণু মডেলে প্রয়োগ করে বোর শুধু পরমাণুর স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা করেন নি, একই সাথে সহজ কিছু ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ডিসচার্জ (তড়িৎ আধান হ্রাস) বা তাপের ফলে উত্তপ্ত কোনো পরমাণুও উত্তেজিত অবস্থায় যে রেখা বর্ণালী তৈরি করে তা তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণও করেছেন। **তাঁর তত্ত্ব ইলেকট্রনের চলাফেরার ক্লাসিকাল গতিবিদ্যার সঙ্গে কোয়ান্টাম শর্ত আরোপের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা পরমাণুর বিচ্ছিন্ন স্থিতিশীল অবস্থাগুলো নির্ধারণ করে।** এই ক্ষেত্রে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ গাণিতিক সূত্রায়ন পরবর্তীকালে দিয়েছিলেন সামারফিল্ড। বোর বুঝতে পেরেছিলেন কোয়ান্টাম শর্তগুলো নিউটনের গতিবিদ্যার সামঞ্জস্যকে কিছু না কিছু ভাবে বিঘ্নিত করে। সব থেকে সহজ উদাহরণ হল হাইড্রোজেন পরমাণু, যে কেউ বোরের তত্ত্ব দিয়ে ঐ পরমাণুর থেকে যে বিকিরণ হয় তার কম্পাঙ্ক নির্ণয় করতে পারবে। এবং তা পর্যবেক্ষণের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিলে যায়। তবে যেমন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে বিকিরণের কম্পাঙ্ক তার ইলেকট্রনের কক্ষপথের কম্পাঙ্কের সঙ্গে মিলে যায়, তেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনগুলির ঐক্যতান (harmonics) বিকিরণের কম্পাঙ্কের সঙ্গে মেলে না। এই ঘটনা দেখায় যে এই তত্ত্ব তখনও সম্পূর্ণ স্ববিরোধ নিয়ে গঠিত। **কিন্তু এটি সত্যের এক অপরিহার্য অংশ ধারণ করেছিল।** তাঁর বর্ণিত তত্ত্ব পরমাণুর রাসায়নিক আচরণ ও রেখা বর্ণালীকে গুণগতভাবে ব্যাখ্যা করেছিল; বিচ্ছিন্ন স্থিতিশীল অবস্থার অস্তিত্ব ফ্রাঙ্ক ও হার্টর্জ, স্টার্ন ও গের্লাখ-এর পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া গেছিল।

বোরের তত্ত্ব একটি নতুন গবেষণার পথ খুলে দিয়েছিল। বহু দশক ধরে বর্ণালীবিক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত বিশাল পরিমাণ পরীক্ষালব্ধ তথ্য (বিভিন্ন মৌলের উত্তপ্ত অবস্থায় পাওয়া বর্ণালী) এখন পরমাণুর ইলেকট্রনের অদ্ভুত কোয়ান্টাম নিয়ম সম্পর্কে জানতে ব্যবহার করা গেল। এই একই উদ্দেশ্যে বহু রসায়নের পরীক্ষা হতে পারে। **এই সময় থেকে পদার্থবিজ্ঞানীরা সঠিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা শিখলো এবং সঠিক প্রশ্ন করা হল সমস্যা সমাধানের অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করা।**

কি ছিল এই প্রশ্নগুলি? বাস্তবে সেগুলো ছিল বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। কি করে সম্ভব, যে বিকিরণ ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন তৈরি করে, ফলে সে অবশ্যই তরঙ্গধর্মী, আবার সে ফটোইলেকট্রিক এফেক্টও তৈরি করে, ফলে তা গতিশীল কণা দিয়েও গঠিত, কি করে সম্ভব? ইলেকট্রনের কক্ষপথের কম্পাঙ্ক পরমাণু দ্বারা নির্গত বিকিরণ কম্পাঙ্কের সঙ্গে মেলে না কেন? এর মানে কি কক্ষপথে চলাচল নেই? কিন্তু কক্ষপথে চলাচল যদি ভুল ব্যাখ্যা হয়, তবে পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রনে কি হয়? ইলেকট্রন পরমাণুর মধ্যে সঞ্চলিত হয় এবং কখনো কখনো একে ক্লাউড চেম্বারে গতিশীল পাওয়া গেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে পরমাণু থেকে আঘাত করে তাকে বাইরে আনা গেছে; কেন তারা পরমাণুর অভ্যন্তরে নড়াচড়া করবে না? এটা সত্যি যে সাধারণ অবস্থায় তারা পরমাণুর অভ্যন্তরে বিশ্রামে থাকে (at rest), যে অবস্থাটা হল সবথেকে নিম্ন শক্তি স্তর। কিন্তু সেখানে আছে আরো উচ্চশক্তি স্তর, যেখানে ইলেকট্রনের কক্ষপথে আছে কৌণিক ভরবেগ (angular momentum) সেখানে ইলেকট্রন স্থির থাকতে পারে না। এর অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। **বার বার এমন পারমাণবিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলে স্ববিরোধ বা দ্বন্দ্বেরই সম্মুখিন হবো।**

বিশের দশকের শুরুতে পদার্থবিজ্ঞানীরা এই সমস্যাগুলির সঙ্গে অভ্যস্ত হতে শুরু করেন। তাঁরা জানতে পারেন কোথায় সমস্যা হবে এবং দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য কিভাবে বর্ণনা দিতে হবে। তাঁরা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে নির্দিষ্ট পরীক্ষা অনুযায়ী কিভাবে পরমাণুর ঘটনা সঠিকভাবে বর্ণনা করা যায়। এটি কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি সামগ্রিক চিত্র তৈরি করতে যথেষ্ট ছিল না, তবে পদার্থবিজ্ঞানীদের মানসিকতা এমন হয়েছিল যা তাঁদের কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করেছিল। এর ফলে, এমনকি কোয়ান্টাম তত্ত্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ পাওয়ার আগেই তাঁরা প্রায়শই অনুমান করতে পারতেন যে কোনো পরীক্ষার ফলাফল কী হবে।

কেউ প্রায়ই আদর্শ পরীক্ষাগুলি নিয়ে আলোচনা করত। এগুলো এমন পরীক্ষা যা কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা সত্ত্বেও এগুলো বাস্তবে চালানো সম্ভব না-ও হতে পারতো। মূল কথা হল প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে তা অত্যন্ত জটিল হতে পারে, তবে অবশ্যই তাত্ত্বিকভাবে এটা সম্ভব হওয়া উচিৎ। এই আদর্শ পরীক্ষাগুলি কিছু সমস্যা সমাধানে কাজে লাগতে পারে। যদি এমন কোনো পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকে, তবে সাধারণত সেই পরীক্ষার অনুরূপ কোনো সহজ পরীক্ষা করা যেত যাতে তার ফলাফল কোয়ান্টাম তত্ত্ব স্পষ্ট করতে সাহায্য করে।

ঐ সব বছরগুলির সবথেকে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ছিল কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বগুলি মুছে না গিয়ে বরং আরও দৃঢ় ও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। উদাহরণস্বরূপ **কম্পটনের এক্স রশ্মি স্ক্যাটারিং**

পরীক্ষা।[*৪] আগের বিচ্ছুরিত আলোর ইন্টারফেয়ারেন্সে প্রাপ্ত ধারণা থেকে বলা যেত বিচ্ছুরণ হয় অবশ্যই এইভাবে ঃ আপতিত আলোর তরঙ্গ ইলেকট্রনকে তার কম্পাঙ্কে কম্পিত করে তোলে; কম্পিত ইলেকট্রন একই কম্পাঙ্কে গোলোক আকারে তরঙ্গ নির্গত করে এবং তাতে আলোর বিচ্ছুরণ হয়। তবে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কম্পটন দেখতে পান যে বিচ্ছুরিত এক্স-রশ্মির কম্পাঙ্ক, আপতিত এক্স-রশ্মির কম্পাঙ্কের থেকে আলাদা। এই কম্পাঙ্কের পরিবর্তন ঠিকভাবে বোঝানো যায় যদি ধরা হয় যে বিচ্ছুরণকে ব্যাখ্যা করতে হবে আলোর কোয়ান্টামের সঙ্গে ইলেকট্রনের সংঘর্ষ হিসেবে। আলোর কোয়ান্টামের শক্তি সংঘর্ষকালে পরিবর্তিত হয় এবং যেহেতু কম্পাঙ্ক গুণ প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক হল আলোর কোয়ান্টার শক্তি, তাই কম্পাঙ্কও পরিবর্তিত হওয়া উচিত।

কিন্তু আলোক তরঙ্গের বেলায় কী ঘটে? দুটি পরীক্ষায় – একটি বিচ্ছুরিত আলোর ইন্টারফেয়ারেন্স পরীক্ষা এবং অন্যটি বিচ্ছুরিত আলোর কম্পাঙ্ক পরিবর্তন, উভয়ই যেন কোনোপ্রকার আপোশে না গিয়ে পরস্পর স্ববিরোধীতার সম্মুখিন হয়।

এই সময় থেকে অনেক পদার্থবিজ্ঞানী এটা বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে এই আপাত দ্বন্দ্বগুলির উৎস রয়েছে পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের একদম সহজাত অন্তর্নিহিত গঠনগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। সেজন্য ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের ডে ব্রগলি বস্তুর অতিক্ষুদ্র কণার এই তরঙ্গ ব্যাখ্যা এবং কণা ব্যাখ্যার মধ্যকার দ্বৈততাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নিলেন। তিনি প্রাথমিকভাবে এটা করলেন ইলেকট্রনের উপর। তিনি দেখালেন একটি নির্দিষ্ট ম্যাটারওয়েভ থাকবে একটি গতিশীল ইলেকট্রনের সাথে ("correspond" to a moving electron)। ঠিক যেমন একটি আলোক তরঙ্গের সাথে থাকে অনুরূপ আলোর কোয়ান্টাম। সেই সময় এটা স্পষ্ট ছিল না, এই সাথে থাকা অনুরূপ ("correspond") কথার অর্থটা এই ক্ষেত্রে কি দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু ডে ব্রগলি প্রস্তাব রাখলেন যে বোরের তত্ত্বের কোয়ান্টাম অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যাবে ম্যাটার ওয়েভ নামক বিবৃতি দ্বারা। একটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে যে তরঙ্গ আবর্তমান তা জ্যামিতির নিয়মেই একমাত্র একটি স্থায়ী তরঙ্গ (stationary wave) এবং এর পরিসীমা অবশ্যই তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পূর্ণসংখ্যায় গুণিতক (integer multiple of the wave length) হবে। **এইভাবে ডে ব্রগলির ধারণা কোয়ান্টাম অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল যা সবসময়ই ইলেকট্রনের গতিবিদ্যায় তরঙ্গ এবং কণার দ্বৈততারূপ একটি বহিরাগত তত্ত্ব হয়ে রইলো।**

বোরের তত্ত্বে ইলেকট্রনের কক্ষপথের হিসেব অনুযায়ী প্রাপ্ত কম্পাঙ্ক ও নির্গত বিকিরণের কম্পাঙ্কের মধ্যে অসামঞ্জস্যকে ইলেকট্রনের কক্ষপথের সম্পর্কে ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতারূপে দেখানো হোত। এই ধারণা শুরু থেকেই কিছুটা সন্দেহজনক ছিল। তবে উচ্চতর কক্ষপথের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াস থেকে অনেক বেশি দূরে সঞ্চলিত হয়। ঠিক যেমন তাদের ক্লাউড চেম্বারে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে এগুলোকে ইলেকট্রনিক অরবিট বলা যায়। এই উচ্চতর কক্ষপথের জন্য ইলেকট্রনের নির্গত বিকিরণের কম্পাঙ্কগুলি কক্ষপথের কম্পাঙ্কের কাছাকাছি থাকে এবং এদের ঐক্যতান হয় উচ্চমাত্রায়। এছাড়াও বোর তার প্রাথমিক প্রকাশনাগুলিতেও বলেছেন যে নির্গত বর্ণালীর রেখার তীব্রতা তার সাদৃশ্যপূর্ণ হারমনিকগুলির তীব্রতার কাছাকাছি পৌঁছায়। এছাড়া বোর ইতিমধ্যে প্রস্তাব রেখেছিলেন তাঁর প্রথম জীবনের গবেষণাপত্রগুলিতে যে বিকিরিত বর্ণালীর রেখাগুলির তীব্রতা তার ঐক্যতানে থাকা সাথে চলা (corresponding harmonics) তরঙ্গের তীব্রতার কাছাকাছি যাবে। এই একসাথে চলার নীতি খুব কার্যকরী হয়েছিল বর্ণালীর রেখার তীব্রতা মোটামুটি সঠিকভাবে মাপতে।

এইভাবে বোরের তত্ত্ব পরমাণুর অভ্যন্তরে পরিমাণগত না হলেও গুণগত অবস্থার বর্ণনা দিল – যেগুলো আবার তরঙ্গ এবং কণার দ্বৈততার সঙ্গে সম্পর্কিত। (ক্রমশ)

টীকা ঃ

১। ব্ল্যাক বডি ঃ একটি বস্তুকে ব্ল্যাক বডি বলা হবে যদি সেটি তার উপরে আপতিত সকল বিকিরণকে শোষণ করে নেয়। পরীক্ষাগারে একটি ব্ল্যাক বডির মতো বস্তু তৈরি করতে গেলে একটি ফাঁপা প্রকোষ্ঠ লাগবে, যার ভিতরের দেওয়াল হবে কালো বা ব্ল্যাক এবং তাতে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকবে। এই ছিদ্র দিয়ে বাইরে থেকে কোনো বিকিরণের প্রবেশ ঘটবে। এর ভিতরের দেওয়াল কালো হওয়ায় আপতিত রশ্মির অধিকাংশ শোষিত হবে। বাকি প্রতিফলিত রশ্মি পুনরায় প্রকোষ্ঠের দেওয়ালের অন্যত্র বারবার প্রতিফলিত ও শোষিত হতে হতে একসময় আদর্শ অবস্থার সমস্ত বিকিরণের শোষণ হবে। তাপগতিবিদ্যার সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে এমন ব্ল্যাক বডি থেকে বিকিরণ হয়। একে বলে ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন।

২। ডিফ্রাকশন ঃ বিকিরিত রশ্মির ডিফ্রাকশন হল ইন্টারফিয়ারেন্সের মতো একই ভৌত প্রভাব। তবে অনেক তরঙ্গের সুপারপজিশনের ফলে এটা হয়। যখন আলো কোনো সূক্ষ্মছিদ্র বা ধার বরাবর যায়, তখন সে বাধা অতিক্রমের জন্য বেঁকে যায়, একে বলে আলোর ডিফ্রাকশন। আলোর এই বৈশিষ্ট্য তার তরঙ্গ ধর্মকেই প্রকাশ করে।

৩। ইন্টারফিয়ারেন্স ঃ একাধিক তরঙ্গের একত্রে একজায়গায় আসাকে বলে ইন্টারফিয়ারেন্স বা ব্যতিচার। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে থমাস ইয়ং আলোক তরঙ্গের উপর একটি পরীক্ষা করেন। যেখানে দেখা গেল দুটি ঢেউ যখন এক জায়গায় আসে, তখন একটার চূড়ো যেখানে, সেখানে অন্যটারও চূড়ো থাকলে দুটো ঢেউ যোগ হয়, আলো উজ্জ্বল হয়। আবার একটার চূড়ো যেখানে, সেখানে অন্যটার খাদ এসে পড়লে হয় অনুজ্জ্বল বা অন্ধকার। আলোর এই বৈশিষ্ট্য তার তরঙ্গ ধর্মকেই প্রকাশ করে।

৪। কম্পটনের এক্স-রশ্মি স্ক্যাটারিং পরীক্ষা ঃ বিজ্ঞানী আর্থার. এইচ. কম্পটন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ইলেকট্রনের দ্বারা এক্স-রশ্মির ফোটনের স্ক্যাটারিং পরীক্ষা করে ইলেকট্রনের কণা ধর্ম প্রমাণ করেন।

সবুজ ফুসফুস

– তন্ময়

নরম ঘাসের 'পরে
ওরা সব খেলা করে
সবুজের হাতছানি বিকেলের ঠিকানা,
ঘেমেনেয়ে অক্লেশে
বৃষ্টিধারায় ভেসে
মুক্তির স্বাদে ভোলে সহস্র যাতনা।

ধুলো কাদায় গড়াগড়ি
খুনসুটি, হুড়োহুড়ি
হইচই, হুল্লোড়, হাঁই মাঁই কাঁই,
সন্ধ্যা আসে নেমে
তবুও যায় না থেমে
একসাথে মিলেমিশে আরও খেলা চাই।

সতেজ শরীর-মন
খেলা অতি প্রয়োজন
সদা খুশি থাকে তবে শিশুদের প্রাণ,
কংক্রিটের আড়ালে
সবুজকে হারালে
কুঁড়িতেই আনন্দের চির অবসান।

আজ ওরা ম্রিয়মান
বিকোয় ওঁদের প্রাণ
বহুতল ব্যবসার পাতা ফাঁদে,
শিশু কিশোরের দল
হারায় না মনোবল
প্রতিবাদে প্রতিরোধে জোট বাঁধে।

দখলের রাজনীতি
ধরায় যে ভয়ভীতি
হয় ক্ষতি তরতাজা ফুসফুস,
বাঁচাতে আপন মাঠ
করে ওরা প্রাণপাত
জয় আসে অবশেষে, দিলখুশ।

ছবিটি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

সহযোগিতা রাশি ঃ ১৫.০০ টাকা

Registration No.: SO197407 of 2012-13

৯ই অগাস্ট সোনারপুরে রাখীবন্ধন

১৪ই অগাস্ট বেহালা সখেরবাজারে রাত দখল

লক্ষ্মীকান্তপুরে ১৪ই অগাস্ট রাত দখল

২০শে অগাস্ট সোনারপুরে জাতীয় বিজ্ঞান মনস্কতা দিবস পালন

১৪ই অগাস্ট পাথরপ্রতিমায় পথসভা

২০শে অগাস্ট বেহালা ঠাকুরপুকুরে আলোচনা সভা

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে তন্ময় দাশগুপ্ত, ৮৮/৩ ভট্টাচার্য পাড়া রোড, কলকাতা ৭০০০৬৩
কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com Website : https://samikshan.org